বৈষ্ণব প্রদীপ ৩

বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত
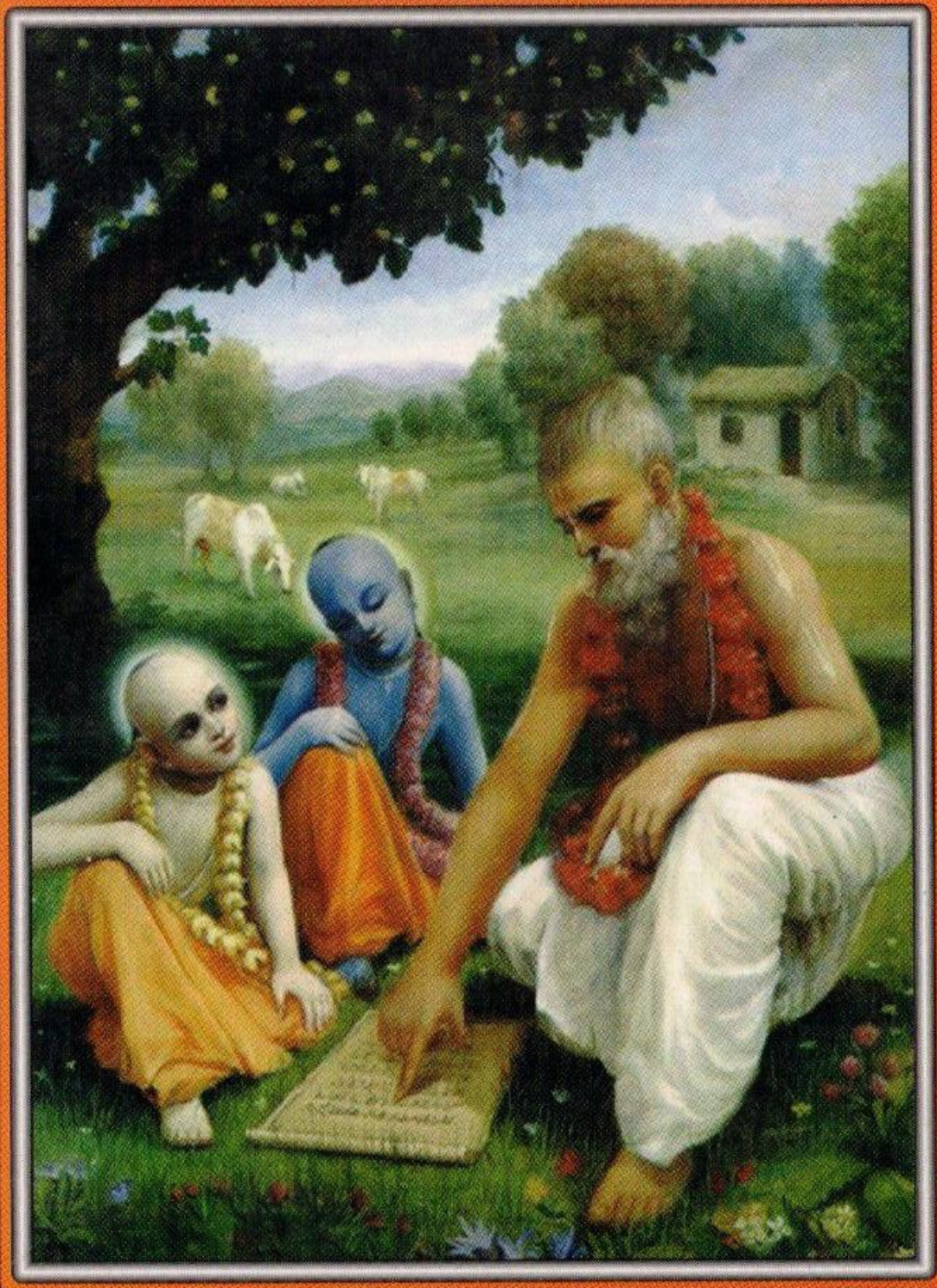
শ্রী মনোরঞ্জন দে

বৈষ্ণব প্রদীপ

(বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত)

তৃতীয় খণ্ড

বৈষ্ণব প্রদীপ

(বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত)

তৃতীয় খণ্ড

শ্রী মনোরঞ্জন দে

সূর্যোদয়

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১১

প্রকাশক
শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাল
সূর্যোদয়
৩৮/4 বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবা. ০১৯১২ ৫২৬৫৫৪
০১৬৮১৬৫১৩৫৫

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১১০০

ভিক্ষা মূল্য : ৩০.০০ টাকা

উৎসর্গ

আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু
নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট
পরম পূজ্যপাদ বৈষ্ণব মহাজন
ড. মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী-এর
করকমলে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বৈষ্ণব প্রদীপ বইটির তৃতীয় খণ্ডের অর্থানুকূল্য করেছেন ভক্তপ্রবর শ্রী রাধাগোবিন্দ সাহা এবং শ্রীমতি সুনীতা সাহা, ৫২ বি. কে. দাস রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা। তাদের পরিবারের সবার উপর শ্রীশ্রী গৌর-নিতাই-এর কৃপা বর্ষিত হউক-এই কামনা রইল।

লেখকের বইসমূহ

১. বৈষ্ণব সম্প্রদায়
২. বৈষ্ণব নামধারী অপ-সম্প্রদায়
৩. দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টী মহান্ত
৪. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলা
৫. শ্রী শ্রী রাধা তত্ত্ব
৬. শ্রী নৃসিংহদেব
৭. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১ম খণ্ড
৮. বৈষ্ণব প্রদীপ : ২য় খণ্ড
৯. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৩য় খণ্ড
১০. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৪র্থ খণ্ড
১১. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৫ম খণ্ড
১২. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৬ষ্ঠ খণ্ড
১৩. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৭ম খণ্ড
১৪. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৮ম খণ্ড
১৫. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৯ম খণ্ড
১৬. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১০ খণ্ড

পরবর্তী বই

১. মহাপ্রভুর বাল্যলীলা
২. মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা
৩. হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র
৪. মহাভারতের যুগে সেনাবাহিনীর গঠন কাঠামো, যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধকৌশল
৫. সর্বোত্তম অর্থনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ
৬. সর্বোত্তম রাজনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ

লেখকের নিবেদন

প্রথমেই আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্ত্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-এর শ্রীচরণকমলে শতকোটি দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করছি।

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীন ইতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবং গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

সনাতন ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিশাল। এই ধর্মের মধ্যে বিশ্বের সবকিছুই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিহিত আছে। বেদ, উপনিষদ, ভগবদ্গীতা, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে সব ধরনের জ্ঞানই অর্ন্তনিহিত আছে। কিন্তু এতসব গ্রন্থ বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই পড়া, বোঝা এবং আত্মস্থ করা সম্ভব নয়।

একথা সত্য ব্যক্তিগতভাবে আমারও সব ধরনের বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ হয় নাই। যতটা সম্ভব পাঠ করেছি, তবে এখনও সব আত্মস্থ করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি। এজন্য এখনও পাঠ করে চলেছি। এই প্রক্রিয়ায় যে সামান্য জ্ঞান লাভ করেছি তার ফসল এই বইটি। আপাততঃ দশ খণ্ডে বিভক্ত এই বইতে দুই হাজার প্রশ্ন ও তার উত্তর সন্নিবেশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বইটির আরও

পরিবর্ধন হতে পারে। তবে এই বইতে বেশিরভাগ প্রশ্ন ও উত্তর বৈষ্ণব ধর্মের আলোকে করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই বইটি আমার সৃষ্ট কিছু নয়। বিভিন্ন প্রামাণিক পুথি-পুস্তকের সহায়তায় এর সংকলন করা হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে হুবহু তথ্য তুলে ধরেছি। তবে এই বইতে কোন প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কারও কোন সংশয় এবং সন্দেহ হলে উপযুক্ত তথ্য এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে প্রকাশকের কাছে পত্র লিখতে পারেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে ভুল সংশোধন করা যায়। কারণ আমাদের লক্ষ্য হলো যে-কোন প্রশ্নের শাস্ত্রীয়ভাবে নির্ভুল উত্তর প্রদান।

যেসব গৌড়িয় ভক্ত এই দীন-অভাজনকে এই ধরনের একটি বই সংকলনের জন্য কৃপাশীর্বাদ করেছেন তাদের মধ্যে ভাগবত প্রবর শ্রী প্রেমরতন গোস্বামী, ভাগবতপ্রবর শ্রী মুকুল পদ মিত্র, ভক্তপ্রবর শ্রী দীপক দেবনাথ, ভক্তপ্রবর শ্রীজয় দেবনাথ, ভাগবত প্রবর শ্রী দীপক গুপ্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী কালিদাস পাল (এ্যাডভোকেট), ভক্তপ্রবর শ্রী প্রণব চৌধুরী, ভক্তপ্রবর শ্রী সত্যরঞ্জন সরকার, ভক্তপ্রবর শ্রী হরিপদ দত্ত, ভক্তিন শ্রীমতি লক্ষ্মী রাণী দত্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী সুবীর পাল, ভক্তপ্রবর শ্রী সঞ্জয় মোদক, ভক্তপ্রবর শ্রী চন্দন পোদ্দার, ভক্তপ্রবর শ্রী নবকুমার শর্মা, ভক্তপ্রবর শ্রী কানাই বিশ্বাস, ভক্তপ্রবর শ্রী মিঠুন দাস এবং ভক্তপ্রবর শ্রী কৌশিক দাসাধিকারী অন্যতম।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
মনোরঞ্জন দে

প্রশ্ন : ৩২৪ ॥ অহল্যা ইন্দ্র কর্তৃক ধর্ষিতা, দ্রৌপদির পঞ্চস্বামী, কুন্তী কুমারী অবস্থায় মা হন, বালীর পত্নী তারা এবং রাবণের পত্নী মন্দোদরী স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের দেবরগণের পত্নী হন। এরপরও তাঁদের নাম স্মরণ করার জন্য বলা হয় কেন?

উত্তর : সাধারণের জড় দৃষ্টিতে অহল্যা প্রমুখ নারীদের দোষ যুক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু মুনি-ঋষিদের দৃষ্টিতে তারা সতী। শ্রীল ব্যাসদেব মথুরার রাজা উগ্রসেনকে একসময় বলেছিলেন মন্দোদরী, শরবী, তারা, অনুসূয়া, অহল্যা, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রমুখ ভগবানের পরম ভক্ত এবং পরমহংস স্বরূপা। এজন্য তাঁদেরকে নিত্য স্মরণ করলে মানুষের অন্তরের পাপ নাশ হয়।

প্রশ্ন : ৩২৫ ॥ অসার সংসারে সারবস্তু কি?

উত্তর : বৃহৎ নারদীয় পুরানে বলা হয়েছে—

অসারভুতে সংসারে সারমেতদাজাত্মজ।
ভগবদ্ভক্তসঙ্গশ্চ হরিভক্তি স্তিতিক্ষুতা ॥ (৪/১৩)

অর্থাৎ এই অসার সংসারে সারবস্তু হল ভগবদ্ ভক্তের সঙ্গ, হরি ভক্তি এবং সহিষ্ণুতা। জীবনের অন্তিম সময় আসলে মানুষের কাছে সংসারকে অসার মনে হয়। আমি আমার—এরূপ ভাবনাযুক্ত সংসারই কৃষ্ণ ভক্তিবিহীন সংসার যা পরিণামে অসার হতে বাধ্য। তাই অসার সংসারে সারবস্তু হল মূলত তিনটি—

১. **ভক্তসঙ্গ**—ভগবদ্ ভক্তদের কাছ থেকে ভগবৎ কথা শ্রবণ। তাঁদেরকে সেবা করা উচিত। অর্থাৎ ভক্ত সঙ্গের পাশাপাশি ভক্ত সেবা করতে হবে।

২. **ভক্তি অনুশীলন**—নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের নাম জপ, ভগবৎ পুজা-অর্চ্চনা করা এবং ভগবৎ প্রসাদ-গ্রহণ করতে হবে। আর ভক্তি বিরুদ্ধ সব ধরনের আচরণ ত্যাগ করা।

৩. **তিতিক্ষা**—দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে।

প্রশ্ন : ৩২৬ ॥ অনেক স্থানেই আজকাল গঙ্গাজল পাওয়া দুর্লভ। এমতাবস্থায় পুকুর, কুয়া অথবা টিউবওয়েলের জল দ্বারা বিগ্রহ সেবা করা যাবে কি?

উত্তর : বর্তমানকালে বেশিরভাগ পুকুরের জলই স্বচ্ছ এবং বিশুদ্ধ নয়। অজ্ঞানী মানুষেরা পুকুরের পাড়ে মল-মূত্র ত্যাগ করে। নানা ধরনের নোংরা জিনিসপত্র পুকুরের জলে নিক্ষেপ করে। আবার পুরানো কুয়াগুলোতেও পচা লতাপাতাসহ ছোট খাট জীবজন্তুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাই স্বচ্ছ এবং বিশুদ্ধ জল পাওয়া কঠিন। আবার অনেক স্থানে টিউবওয়েল ছাড়া জলের ভাল কোন উৎস নেই। এমতাবস্থায় গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী ইত্যাদি নদীর নাম স্মরণ করতে করতে যতদুর সম্ভব পরিশুদ্ধ জল সংগ্রহ করতে হবে। তাছাড়া শাস্ত্রানুযায়ী সাধারণ জল শঙ্খমধ্যে ধারণ করলে তা গঙ্গাজলের সমতূল্য হয়। এই দিয়েই বিগ্রহ সেবা করতে হবে বৈকি।

প্রশ্ন : ৩২৭ ॥ অসুস্থতার কারণে ডাক্তার স্নান করতে বারন করেছেন। এমতাবস্থায় স্নান না করে বিগ্রহ সেবা করা যাবে কি?

উত্তর : শাস্ত্রে অনেক ধরনের স্নানের কথা বলা হয়েছে। যেমন বায়ু স্নান, মানস স্নান, জল স্নান ইত্যাদি। কম অসুস্থ্য থাকলে ঐ অবস্থায় অল্প জলদ্বারা স্নান সেরে নেওয়া যায়। এভাবে জল ব্যবহার না করতে পারলে বিষ্ণুর নাম স্মরণ করে আচমন করা যেতে পারে। তারপর শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে বিগ্রহ সেবা করা যাবে।

প্রশ্ন : ৩২৮ ॥ অসৎ সঙ্গ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী অসৎ ব্যক্তি দুই রকমের হয় : ১. যোষিৎ—অর্থাৎ স্ত্রী সঙ্গী এবং ২. কৃষ্ণের অভক্ত। যোষিৎ সঙ্গী আবার দুই রকমের : (ক) অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গী—অর্থাৎ পরনারীর সঙ্গ বিলাসী এবং (খ) বিবাহিত হলেও স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত মোহ—অর্থাৎ স্ত্রৈণ। অভক্ত দুই ধরনের হয় : (ক) জড় বিষয়ী—অর্থাৎ জড়জাগতিক কামনা-বাসনা পুরনের জন্য অতি তৎপর কিন্তু ভগবানের প্রতি উদাসীন এবং (খ) অপসম্প্রদায়ী—অর্থাৎ বাহ্যিক আচরণে সাধুর মতো দেখতে কিন্তু আসলে পাপাচারী এবং প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ বিদ্বেষী। অসৎ ব্যক্তি এবং অভক্ত—এই দুই শ্রেণীর লোকের সাথে সংসর্গকেই অসৎ সঙ্গ বলা হয়।

প্রশ্ন : ৩২৯ ॥ অনেকে বলেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপতে হবে এবং সেই সাথে কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করতে হবে। কেন?

উত্তর : এক অর্থে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ হল কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন। এই হল মহামন্ত্র। আমি ভবসাগরে নিমজ্জমান এক অধম পাপী। কৃষ্ণ কৃপা না করলে আমার উদ্ধারের কোন উপায় নেই—এই মনোভাব নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ক্রন্দন করলে তিনি অবশ্যই ভক্তকে প্রত্যুত্তর দিবেন। এইজন্য শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলা হয়েছে—

কৃষ্ণবলি কাঁদিলে সে কৃষ্ণ নাম মিলে।
ধনের কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে ॥

তবে কৃত্রিমভাবে কাউকে এবং অনুকরণ করে লোক দেখানো ক্রন্দন করার চেষ্টা করা উচিত নয়। সেটি অর্থহীন হবে।

প্রশ্ন : ৩৩০ ॥ অনেকে বলেন ভগবান নির্ব্বিশেষ এবং নিরাকার। একথা কতদুর সত্য?

উত্তর : ভগবান কিভাবে নির্ব্বিশেষ হবেন? নির্ব্বিশেষ এবং নিরাকার তত্ত্ব বুদ্ধিমত্তাহীন। গীতায় ভগবান শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন, **ময়াধ্যক্ষেন প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম**—অর্থাৎ এই নিখিল বিশ্বচরাচরে যে অদ্ভূত ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেগুলো স্বতন্ত্র বা

স্বাধীনভাবে ক্রিয়াশীল নয় বরং এর পশ্চাতে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। তাঁর নেতৃত্বে এবং ইঙ্গিতেই এই বিশ্ব চরাচর বা প্রকৃতি পরিচালিত হয়। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় (৯/৪) ভগবান আরোও বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্বস্থিতঃ ॥

অর্থাৎ আমি আমার অব্যক্ত মূর্তিতে সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত। নিখিল জীবন আমাতে অবস্থিত হলেও আমি তাদের মধ্যে অবস্থিত নই। যা অব্যক্ত তারও মূর্ত্তি আছে। যেমন আকাশ অব্যক্ত হলেও ব্রহ্মাণ্ডের মতো গোলাকার আকৃতি আছে। সমুদ্রের নিকটে গেলেও আমরা এর বড় বৃত্তাকার এক আকৃতি দেখতে পাই। রূপ ছাড়া কিছুই নেই। সব কিছুরই আকৃতি আছে। এমনকি নির্বিশেষ বলে যা কিছু অনুমান করা হয় তাও সাকার। তাই সবকিছুই শুন্য ও নির্বিশেষ—এই ধারণা মুর্খতার নামান্তর। শ্রী ঈশোপনিষদ এর ৮নং মন্ত্র থেকেও জানা যায় শ্রী ভগবান নিরাকার নন। তাঁর জড়াতীত অপ্রাকৃত দেহ আছে।

প্রশ্ন : ৩৩১ ॥ অর্চাবিগ্রহ এবং পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর : ভগবদ্ ভক্তগণ অর্চনার জন্য মন্দিরে অর্চা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহের সাথে পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃত স্বরূপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ উভয়েই একই সত্ত্বা। অর্চাবিগ্রহ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবান। শ্রী কৃষ্ণই ভগবানের আদিবিগ্রহ বা পরম স্বরূপ। বলদেব, শ্রীরাম, শ্রী নৃসিংহদেব, বরাহদেব ইত্যাদি অসংখ্যরূপে তিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন। এই সব রূপ দেখতে বিভিন্ন হলেও তা এক এবং তিনি অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ভগবান। স্বল্পবুদ্ধির ব্যক্তিগণ ভগবানের অর্চা বিগ্রহকে জড় বা প্রাকৃত বলে মনে করেন। কুতার্কিকেরাই ভগবানের শক্তিমত্তা সম্পর্কে অবগত নন। কেবলমাত্র স্মরণাগতির মাত্রানুসারেই তাঁকে অনুভব করা যায়।

প্রশ্ন : ৩৩২ ॥ অজ্ঞাত এবং জ্ঞাত পাপ কি? অজ্ঞাতসারে পাপ করলেও কি তার ফল ভুগতে হবে?

উত্তর : আমরা জন্ম-জন্মান্তর থেকে জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতভাবে পাপকর্ম করে চলেছি। জেনে শুনে একটি পশু হত্যা করলে তাকে জ্ঞাতসারে পাপ বলা যায়। অর্থাৎ দেখেশুনে এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব বা বোঝা যায় এমন কোন পাপকর্ম করলে তাকে জ্ঞাত পাপকর্ম বলে। যেমন চোর চুরি করে নিজের জ্ঞাতসারে।

আবার অজ্ঞাতসারেও আমরা অনেক পাপকর্ম করি। যেমন রাস্তা দিয়ে হাটার সময় আমাদের অজ্ঞাতে কত পিপড়ে বা পোকামাকড় মারা যায়। আবার রান্নার কাজে, জলপানের সময়, দূরে ঢিল নিক্ষেপ ইত্যাদি দ্বারা আমরা অজ্ঞাতসারে অনেক জীব হত্যা করি। এগুলো হল অজ্ঞাত পাপ।

অজ্ঞাতবশত কোন শিশু আগুনে হাত দিলে তার অর্থ এই নয় যে আগুন তাকে পোড়াবে না। যদি কেউ বিচারের কাঠগড়ায় দাড়িয়ে বলে যে আমি জানতাম না বলে এই অপরাধ হয়েছে। তাহলেও বিচারক তাকে ক্ষমা করবে কি? আইন অনুযায়ী তার শাস্তি হবেই। অনুরূপ অজ্ঞাতসারে পাপকর্ম করলেও তার ফল ভোগ করতে হবে। তাই কোন অজুহাতেই অজ্ঞাত পাপ থেকেও রেহাই পাওয়া যায় না। তবে ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণানুশীলন করতে পারলে—অর্থাৎ কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ তথা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নিষ্ঠা ভরে জপ করতে পারলে সব ধরনের পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কারণ পরমেশ্বর ভগবানই গীতায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সব কিছু ত্যাগ করে আমার শরনাপন্ন হও, তাহলে সব পাপের কর্মফল থেকে মুক্ত করে আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করবো।

প্রশ্ন : ৩৩৩ ॥ অনেকে অবহেলা করে কৃষ্ণ নাম জপ করে। এতে তাদের কি পাপ হবে না?

উত্তর : হরিনাম, কৃষ্ণ নাম এবং হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের কোন স্থান, কাল, পাত্র নেই। সবাই যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে এই নাম জপতে পারেন। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র সম্পর্কে ঋক্‌বেদে বলা হয়েছে যে

এই মন্ত্রের অর্থ প্রথমে না বোঝলেও চলবে। কেউ যদি ভগবানের দিব্য নাম-রূপ এই পবিত্র মন্ত্রের অক্ষরগুলিও শুধুমাত্র যে কোনভাবে আবৃত্তি করতে থাকে তবে ধীরে ধীরে একদিন এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ তার কাছে হৃদয়ঙ্গম হবে। **শ্রীমদ্ ভাগবতে** বলা হয়েছে—

সাঙ্কেত্যম্ পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনম্ এব বা
বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণম্ অশেষাখহরং বিদুঃ ॥

—অর্থাৎ অন্য কোন বস্তুকে লক্ষ্য করে হোক, পরিহাসচ্ছলে হোক, সঙ্গীত বিনোদনের জন্য হোক অথবা অশ্রদ্ধার সঙ্গেই হোক শ্রী ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করলে তৎক্ষণাৎ অশেষ পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

প্রশ্ন : ৩৩৪ ॥ অর্জুন করুক্ষেত্রের যুদ্ধে অনেক লোককে হত্যা করেছেন। এতে কি তার কোন পাপ হয় নাই?

উত্তর : প্রথমতঃ অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়। শাস্ত্র অনুযায়ী ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত হন শত্রুদের পরাস্ত করতে এবং প্রজাদের রক্ষার জন্য এবং দুষ্কৃতিকারীদের বধ করার জন্য।

দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রে (মনুসংহিতা) বলা হয়েছে ৬ ধরনের লোককে হত্যা করা যায় : (১) যারা ঘরে অগ্নিসংযোগ করে, (২) ভূমি দখল করে, (৩) স্ত্রী অপহরণ করে (৪) বিষ প্রয়োগ করে, (৫) অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে এবং (৬) ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে। পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধনেরা এইসব অত্যাচার করেছিল। তাই কৌরবদের হত্যা করলেও অর্জুনের কোন পাপ হয় নাই।

তৃতীয়তঃ ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে কাউকে হত্যা করলে পাপ হয় না। সর্বোপরি অর্জুন পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ পালন করেছিলেন। তাই তার কাজে পাপ হবে কি করে?

প্রশ্ন : ৩৩৫ ॥ অনেকে বলেন কর্মই ধর্ম। এটি কতটুকু সত্য?

উত্তর : কর্ম ছাড়া কেউ থাকতে পারে না। এমনকি দেহ যাত্রাও নির্বাহ হয় না (গীতা ৩/৮)। তবে সকাম কর্ম যথার্থ ধর্ম নয়। কেবল ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য কর্ম করলেই তা ধর্ম হতে পারে, অন্যথায় নয়।

কারণ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিই কর্মফল ত্যাগ করে কর্ম সম্পাদন করে বলে নিয়ত শান্তি লাভ করতে পারেন। সকামকর্ম সংসারে বন্ধনের কারণ হয় (গীতা ৫/১১)। কর্মের ধরন অনুযায়ী কেউ নরকে যেতে পারে। কেউ স্বর্গে যেতে পারে, আবার কারোও বৈকুণ্ঠে গতি হয়। তাই সব কর্মই ধর্ম নয়—একথা বুঝতে হবে।

প্রশ্ন : ৩৩৬ ॥ অনবরত সৃষ্টি এবং ধ্বংস ঘটে চলেছে। এই সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে সময়ের পার্থক্য কতটুকু?

উত্তর : এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি স্তর আছে : সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়। অতএব সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যবর্তী সময় হল স্থিতি। এই স্থিতির সময় হল ব্রহ্মার জীবনকাল। ব্রহ্মার যখন আয়ু শেষ হয়ে যায় তখন আর স্থিতি থাকে না। তখন ধ্বংস বা প্রলয় শুরু হয়। এখন হিসাব করে দেখুন ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল কত? ব্রহ্মার একদিন হল জড়জগতের ৪৩২ কোটি বছর। একরাত্রিও তাই। তার দিবারাত্রি হল আমাদের জড়জগতের ৮৬৪ কোটি বছর। ব্রহ্মার আয়ু ব্রহ্মলোকের হিসাবে ১০০ বছর। তাই ৮৬৪ × ৩৬৫ × ১০০ কোটি বছর হবে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল। এই হল জড়জগতের স্থিতিকাল। এই বিশাল সময়ও কারণবারী সাগরে শায়িত মহাবিষ্ণুর এক মুহূর্তের সমান মাত্র। মহাবিষ্ণুর শ্বাস ত্যাগ হল সৃষ্টি। শ্বাস গ্রহণ হল প্রলয় বা ধ্বংস। শ্বাস ত্যাগ এবং গ্রহণের মধ্যবর্তী যে ক্ষনিক সময় সেটাই এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির স্থিতিকাল।

প্রশ্ন : ৩৩৭ ॥ অনেকে বলেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চস্বরে জপ করা উচিত। অন্যেরা বলেন মনে মনে জপ করা ভাল। কোনটি সঠিক?

উত্তর : হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র যে কোনভাবেই জপ করা যায়। এই মহামন্ত্র তিনভাবে জপ করা যায় : ১. মানস জপ, ২. উপাংশু জপ এবং ৩. উচ্চস্বরে জপ। মনে মনে জপ করার নাম মানস জপ। ঠোঁট নাড়িয়ে এবং নিজকর্ণে শুনা যায় এভাবে জপ করলে তাকে উপাংশু জপ বলে। আর নিজে এবং অন্যেরাও যেন শুনতে পায় এরূপভাবেও জপ করা যায়। প্রথম দুই পদ্ধতিতে জপ করলে শ্রবণহেতু শুধুমাত্র নিজের মঙ্গল

লাভ হয়। শেষোক্ত উপায়ে জপ করলে নিজের সহ শ্রোতাদেরও মঙ্গল হয়। এই জন্য নামাচার্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর বলেছেন যে মনে মনে হরিনাম করার চেয়ে উচ্চস্বরে হরিনাম করা শতগুণে ভালো।

উচ্চ করি লৈলে শতগুণ পূণ্য হয়।
দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয় ॥

(চৈতন্য ভাগবত আদি ১৬/২৭৩)

শ্রী নারদীয় পুরানে আছে—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈ জপন শ্রোতৃন পুনাতি চ ॥

অর্থাৎ যিনি মনে মনে হরিনাম করেন তার থেকে উচ্চ স্বরে হরিনামকারী শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ মনে মনে নামকারী কেবল নিজেকে পবিত্র করেন। উচ্চস্বরে নামকারী নিজেকে এবং শ্রোতাদেরকেও—অর্থাৎ সবাইকে পবিত্র করেন।

প্রশ্ন : ৩৩৮ ॥ অনেকে বলেন কৃষ্ণই আসল গুরু। একথার মানে কি?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন। আপনি কৃষ্ণের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারেন। এই জন্য কৃষ্ণের আরেক নাম হল চৈত্য গুরু—অর্থাৎ যে গুরু হৃদয়ে আছেন। দীক্ষা গুরু এবং শিক্ষা গুরু হিসাবে কৃষ্ণ বাইরে রয়েছেন এবং চৈত্য গুরুরূপে তিনি সবার হৃদয়ে রয়েছেন। দীক্ষা গুরু এবং শিক্ষাগুরু শ্রী কৃষ্ণেরই প্রকাশমাত্র। এই অর্থে কৃষ্ণই আসল গুরু বলা যায়। আমরা এই দুই গুরুর সেবা করেই জীবন সার্থক করে তুলতে পারি।

প্রশ্ন : ৩৩৯ ॥ অনেকের মুখে শুনি জীবই ব্রহ্ম বা ভগবান। একথা কি ঠিক?

উত্তর : এরূপ কথা মায়াবাদী দার্শনিক বা গুরুদের এবং তদীয় শিষ্যদের মুখেই শোনা হয়। এটি এক ধরনের কলুষতা। কারণ মায়াবাদীদের বুদ্ধিমত্তা অপরিচ্ছন্নময়। তারা ভাবছে তারাই ব্রহ্ম বা

ভগবান। আসলে কৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর ভগবান এবং আমরা হলাম তাঁর দাস। অর্থাৎ জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। এইজন্য ভগবদ গীতায় শ্রী কৃষ্ণ বলতে পেরেছেন—**সর্ব্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরনং ব্রজ** কারণ কেবলমাত্র মালিকই তার দাসদেরকে এরূপ কথা বলতে পারেন। মায়াবাদীরা এই সহজ কথাটি বুঝতে চায় না, বা বুঝলেও এড়িয়ে গিয়ে মন গড়া কথা বলে। কারণ এখানে সেবকই মালিক হতে চাইছেন যা কখনো সম্ভব নয়। সেবক যদি বিশ্বস্তভাবে সেবক রূপে থেকে যায় তবে সেটিই তার জীবনের সার্থকতা। দাস কৃত্রিমভাবে মালিক হতে চাইলে তা হবে একধরনের বিরক্তিকর অবস্থা। এজন্যই শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেন, মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ।

প্রশ্ন : ৩৪০ ॥ অনেকে বলেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের হরে রাম বলতে শ্রী রামচন্দ্রকে বুঝায়, আবার অন্যেরা বলেন এই রাম হলেন বলরাম। কোনটি সঠিক?

উত্তর : উভয়ই সঠিক। এ বিষয়ে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার ৫/১৩২ নং শ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবৃন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যা বর্ণনা করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা হল : "হায়দ্রাবাদে আমরা যখন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করছিলাম তখন আমাদের দুজন সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। তাদের একজন বলেছিল **হরে রাম** বলতে শ্রী বলরামকে সম্বোধন করা হচ্ছে, আর অন্য এক জন বলেছিল যে **হরে রাম** মানে হচ্ছে শ্রী রামচন্দ্র। অবশেষে তারা তাদের সেই তর্কের সিদ্ধান্ত করার জন্য আমার কাছে আসে, আর আমি বলেছিলাম, কেউ যদি বলে **হরে রাম** এর রাম হচ্ছেন শ্রী রামচন্দ্র, আর কেউ যদি বলে **হরে রাম** এর রাম হচ্ছেন শ্রী বলরাম, তাহলে তাদের দুজনেই ঠিক; কেননা শ্রী বলরাম ও শ্রী রামচন্দ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতেও দেখা যায়, শ্রীল কৃষ্ণ দাস কবিরাজ গোস্বামীও সেই সিদ্ধান্তই করেছেন—

যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণ, কিছু মিথ্যা নহে ॥

কেউ যদি **হরে রাম** মন্ত্রে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করেন অথবা রামচন্দ্রকে বোঝেন তাহলে তা ভুল নয়। কেউ যদি বলে যে হরে রাম মানে শ্রী বলরাম তাহলে তিনিও ঠিক। যাঁরা বিষ্ণু তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত, তাঁরা এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তর্ক করেন না।"

প্রশ্ন : ৩৪১ ॥ অনেকে দাবী করেন যে গীতার নবম অধ্যায়ের ৩২ নং শ্লোকে নীচ বংশজাত শুদ্র এবং চণ্ডালের সাথে সমানভাবে স্ত্রীলোক এবং বৈশ্যদের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আসলে কি তাই?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় বলা হয়েছে—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শুদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাংগতিম্ ॥

এই শ্লোকটিকে উদ্ধৃত করে কেউ উপরোক্ত প্রশ্নের অবতারণা করলে তা ভুল হবে। আমাদের সমাজে অনেকেই স্ত্রীলোকদের পক্ষে পুজা-অর্চনাসহ আরোও কিছু বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে। আবার অনেকে স্ত্রীলোকদের বিভিন্ন ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কে কুসংস্কারমূলক মনোধর্মী ব্যাখ্যা দেয়। তাই এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে ভক্তিযোগের ক্ষেত্রে সবার অধিকারই সমান। শুদ্র, চণ্ডাল, স্ত্রীলোক এবং বৈশ্যদের (ব্যবসায়ী শ্রেণী) নাম একসঙ্গে উল্লেখ করায় এই বুঝায় না যে তারা একই সমাজে সমমর্যাদাসম্পন্ন। শুধুমাত্র ভগবানের চরণাশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে সবাই সমান অধিকার সম্পন্ন—এই কথাই বলা হয়েছে। এককথায় ভক্তিমার্গে সবাই সমান। এটি কি উদার মনোভাবাপন্ন বাণী নয়?

প্রশ্ন : ৩৪২ ॥ অস্পৃশ্য, অশুচি এসব বাচবিচার গীতার মতো পবিত্র ধর্মগ্রন্থে আনা কি ঠিক হয়েছে?

উত্তর : চারটি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র) বাইরে যারা তাদেরকেই অন্ত্যজ, পাপযোনি (নিচ বংশজাত) চণ্ডাল বলা হয়। কারণ এসব লোক নোংরা, অকাজ, কুকাজ ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকে। আদিকাল

থেকেই এই ধরনের লোক আছে। যেমন আফ্রিকার জঙ্গলে বসবাসরত অসভ্য জংলী লোকজন, ভারতে চণ্ডাল—যারা মৃতদেহ দাহ করে। এরা অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য এবং অশুচি বলে পরিচিত এই কারণে যে সাধারণ মানুষেরা এদের সঙ্গ করলে তারা নিজ নিজ বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে বিচ্যুত হতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণীর মানুষেরাও ভগবানের আশ্রয় নিলে মুক্তি লাভ করতে পারে এই কথাই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করার জন্য এদের পরিচয় গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, এদেরকে হেয় করার লক্ষ্যে নয়। তাহলে দেখুন ভগবান কত করুণাময় যে তাঁর শরনাগত হলে বর্ণাশ্রম ধর্মের বাইরের কোন মানুষও পরিত্রাণ পেতে পারে।

প্রশ্ন : ৩৪৩ ॥ অর্জুন গীতায় স্ত্রীষু দুষ্টা—অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা দুষ্ট—এই কথাটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতো ভক্তের মুখে এরূপ কথা শোভা পায় কি?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় (১/৪০) ভগবান তাঁর সমকালীন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কিছু স্ত্রীলোক যে দুষ্টা প্রকৃতির তার উল্লেখই করেছেন মাত্র। সব স্ত্রীলোকদেরকে নয়—একথা বুঝতে হবে। কারণ গীতার ১/৪২ নং শ্লোকেই বলেছেন স্ত্রীলোকদের দোষের ফলে সমাজে বর্ণ সংকর সন্তানাদি সৃষ্টি হয়। এতে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা আজকের যুগেও লক্ষ্য করা যায়। আজকে নারী শিক্ষার এত প্রসার হওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখি অনেক দেশে অনেক স্থানে ব্যভিচার, অবাধ মেলামেশা ইত্যাদির ফলে বর্ণ সংকর সন্তান সৃষ্টি হচ্ছে। এতে ঐসব দেশে এবং স্থানে সামাজিক অশান্তি বিরাজ করছে। তাই কিছু স্ত্রীলোকতো বাস্তবে দুষ্টাই—একথা বললে অসত্য কোথায়? কারণ দুষ্টা বলতে বিভিন্ন দোষ যুক্তা স্ত্রীলোকদেরকেই অর্জুন বুঝিয়েছেন মাত্র।

প্রশ্ন : ৩৪৪ ॥ অনেকে বলেন কৃষ্ণ আমাদের মতোই একজন ব্যক্তি ছিলেন। একথা কতদূর সঠিক?

উত্তর : কেবলমাত্র অতিমুর্খ, মূঢ় এবং নরাধম ব্যক্তিদের পক্ষেই এরূপ কথা উচ্চারণ করা সম্ভব। পরমেশ্বর ভগবান একজন সবিশেষ

ব্যক্তি, ভিন্ন ধরনের ব্যক্তি। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—অর্থাৎ তার দেহ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। আমাদের মতো পঞ্চভৌতিক দেহ নয়। তাঁর দেহ আনন্দময়, কিন্তু জীবের দেহ দুঃখময়। তাঁর দেহ জ্ঞানময়, কিন্তু আমাদের দেহ অজ্ঞতায় পূর্ণ। তিনি নিয়ন্ত্রক, আর জীব হল নিয়ন্ত্রিত। তাহলে কিভাবে ভগবান আমাদের মতো একজন সাধারণ ব্যক্তি হতে পারেন?

প্রশ্ন : ৩৪৫ ॥ অবিদ্যা কি? অবিদ্যা বলতে কি লেখাপড়া না জানা বুঝায়?

উত্তর : অবিদ্যা বলতে লেখাপড়া না জানা বুঝায় না। অবিদ্যার অর্থ হল অজ্ঞানতা। এই জড়জগত ভগবানের একটি শক্তি। কিন্তু এখানে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা অবস্থান করছে। অজ্ঞতা এই জড় জগতের বৈশিষ্ট্য। তাই প্রত্যেককেই কর্ম করতে হচ্ছে। জীব অবিদ্যার মধ্যে অবস্থান করায় তাকে কর্ম করতে হয়।

প্রশ্ন : ৩৪৬ ॥ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শন/মতবাদ কি?

উত্তর : সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে সমান্তরালভাবে ভিন্ন এবং অভিন্ন। দুই শ্রেণীর দার্শনিক আছেন। একশ্রেণী বলছেন, ভগবান এবং জীব ভিন্ন। অন্য শ্রেণী বলছেন, ভগবান এবং জীব অভিন্ন—অর্থাৎ ভগবান ও জীব হলেন একই। এরা হলেন অদ্বৈতবাদী। আর আগের দার্শনিকরা হলেন দ্বৈতবাদী। এই দুই মতবাদের সমন্বয় করে যে দর্শন গড়ে উঠে তাকে অচিন্ত্য—ভেদাভেদ দর্শন বলে। এই দর্শন বলে যে ভগবান এবং জীব একই সঙ্গে অভিন্ন এবং ভিন্ন-অর্থাৎ জীব এবং ভগবান গুণগতভাবে অভিন্ন। ঠিক যেমন শক্তি এবং শক্তিমান। সূর্য এবং তার কিরণ। গুণগতভাবে সূর্য কিরণের মধ্যে তাপ এবং আলোক আছে। সূর্যেও তাপ ও আলোক রয়েছে। কিন্তু সূর্য কিরণ ও সূর্যের তাপ ও আলোকের মাত্রা ভিন্ন। আপনি সূর্য কিরণের তাপ ও আলো সহ্য করতে পারেন। কিন্তু কখনো সূর্যের কাছে যেতে পারেন না বা সেখানে গিয়ে সূর্যের তাপ ও আলো সহ্য করতে পারেন না। তেমনি ভগবান ও

জীব গুণগতভাবে এক। কিন্তু পরিমাণগতভাবে জীব হল অত্যন্ত ক্ষুদ্র বা অনুচৈতন্য। আর ভগবান হলেন বিভু—অর্থাৎ সর্বত্র বিরাজমাণ চৈতন্য।

[এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার লেখা *বৈষ্ণব সম্প্রদায়* বইটি দেখতে পারেন।]

প্রশ্ন : ৩৪৭ ॥ অনেকেই বলেন যে গীতা পাঠের পর এর মাহাত্ম্য পাঠ না করলে নাকি গীতা পাঠ নিষ্ফল হয়। একথা সত্যি কি?

উত্তর : গীতা পাঠের অধিকারী কে তা প্রথমেই জানতে হবে। যিনি প্রকৃত ভগবৎ ভক্ত তিনিই গীতা পাঠের সত্যিকারের অধিকারী। কোন অভক্ত যদি গীতাকে সাধারণ বই মনে করে পাঠ করে যায় তবেতো গীতা পাঠের কোন সুফলই সে আশা করতে পারে না। ভগবান বলেছেন আমাতে চিত্ত যার সমর্পিত সেই আমার কথা বুঝতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী চলবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাক্ষিনাত্য ভ্রমনের সময় শ্রী রঙ্গনাথ মন্দিরে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে গীতা পাঠ করতে দেখে প্রশ্ন করেছিলেন যে গীতা পাঠে তাঁর কি অনুভূতি হয়। উত্তরে ব্রাহ্মণ বলেছিলেন যে গীতা পাঠের সময় তিনি মানসচক্ষে দেখতে পান যে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে রথের উপর বসে আছেন অর্জুন, আর তাকে উপদেশ দিচ্ছেন ভগবান শ্রী কৃষ্ণ। মহাপ্রভু বলেন যে সেই গীতা পাঠের অধিকারী এবং তার কাছেই গীতাপাঠের মাহাত্ম্য আপনা-আপনি প্রতিভাত হয়। তাকে আলাদা করে আর গীতামাহাত্ম্য পাঠ করতে হবে না।

প্রশ্ন : ৩৪৮ ॥ অযোধ্যা নগরী কে নির্মাণ করেছিলেন? একে অযোধ্যা নগরী বলা হয় কেন?

উত্তর : ভারতের সরযু নদীর তীরে অযোধ্যা নগরীর অবস্থান। এই নগরী শ্রী বৈবস্বত মনু কর্তৃক নির্মিত হয়। প্রাচীনকালে এই নগরীর দৈর্ঘ্য ছিল ১৫০ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ছিল ৩৬ কিলোমিটার।

অযোধ্যার উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বিন্দ্যাচল পর্বত। এই দুইয়ের কাছাকাছি অঞ্চল বিভিন্ন ধরনের বিশাল বিশাল হাতীতে পূর্ণ ছিল। বাইরের শত্রুরা এই অঞ্চলকেই অযোধ্যা বলে মনে করতো। তাই আক্রমণ করে এই নগরী জয় করা সম্ভব ছিল না বলেই এর অযোধ্যা নাম সার্থক হয়।

প্রশ্ন : ৩৪৯ ॥ অষ্টাঙ্গযোগের আটটি অঙ্গ কি কি? যে কেউ কি এই যোগসাধনা করতে পারবেন?

উত্তর : অষ্টাঙ্গযোগের আটটি অঙ্গ হল নিম্নরূপ—

১. **যম**। এর পাঁচটি সাধন—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ।

২. **নিয়ম**। এর সাধন পাঁচটি—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর প্রণিধান (বা উপাসনা)।

৩. **আসন**। আসন হল হাত এবং পায়ের বিশেষ সংস্থান যাতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ স্থির এবং নিশ্চল থাকতে পারে। যেমন পদ্মাসন, সস্তিকা আসন ইত্যাদি।

৪. **প্রাণায়াম**। শাস-প্রশ্বাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করে জীবনী শক্তি বশে আনার চেষ্টা।

৫. **প্রত্যাহার**। ইন্দ্রিয়গণ কোন দিকে ধাবিত হলে তাদেরকে নিবৃত্ত করে পুনরায় আত্মাতে স্থাপন করা।

৬. **ধারণা**। কোন বিশেষ বস্তু বা আধারে চিত্ত বা মনকে নিবিষ্ট করে রাখা।

৭. **ধ্যান**। সমাধি লাভের উদ্দেশ্যে দেহের মূলাধার থেকে আজ্ঞাচক্রে উঠার প্রক্রিয়া।

৮. **সমাধি**। চরম বা সিদ্ধি অবস্থা। ধ্যানেরই পরিণতি সমাধিতে।

অষ্টাঙ্গযোগের উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি বহুদিন নিষ্ঠার সাথে প্রয়াস সাধ্য। তাছাড়া দেহ ও মনের নিয়ন্ত্রণ স্তরে পৌছতে হলে অভিজ্ঞ গুরুর

নির্দেশ অপরিহার্য। তা না হলে সফলতার পরিবর্তে শারীরিক বা মানসিক অথবা উভয়ের বৈকল্য আসতে পারে। এই জন্য বই পড়েই অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস চেষ্টা না করাই উচিত।

প্রশ্ন : ৩৫০ ॥ অনেকে এরূপ মন্তব্য করেন যে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ নিজেরা পুরুষ বলে নারী জাতিকে ঘৃণ্যরূপে প্রচার করেছেন। একথা কি ঠিক?

উত্তর : এরূপ কথা সর্বতোভাবে অজ্ঞানতা প্রসুত। সনাতন ধর্মের বহু শাস্ত্রে মাতাকে মহিয়সী বলে প্রত্যেক জননীকে জগৎ জননীর প্রতিমূর্ত্তি বলেও বর্ণনা রয়েছে। **জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী**—অর্থাৎ জননী জন্মভূমি এবং স্বর্গের চেয়েও উপরে। **যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা**—চণ্ডী (৫/৭১) গ্রন্থের এই কথা মনে করুন। এরূপ কথা কি অন্যকোন জাতি বা ধর্মে আছে? যে নারীকে এড়াতে সনাতন ধর্মে উপদেশ রয়েছে তিনি রমণী ও দৈহিক ভোগ্যপন্যা মাত্র। আর যাঁকে পুজা করতে বলেছে তিনি জননী—যাঁর করুণায় প্রতিটি শিশু প্রতিপালিত হয়ে বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা হয়। বংশরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন নারীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক ততটুকুই রাখবে এবং পঞ্চযজ্ঞে নিরত থেকে ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়সমূহকে নিবৃত্তিমুখী করার উপদেশই শাস্ত্রে আছে। সন্তান লাভের পর নারী তার মোহিনী রমণী মূর্ত্তি ত্যাগ করে মহিয়সী মাতৃরূপে সংসারের অধ্যক্ষতা করবেন এই কথাই সনাতন শাস্ত্রে বলা হয়েছে। **মনুসংহিতায়** বলা হয়েছে—

উপাধ্যায়ান্ দশাচার্য্য আচার্য্যাণাং শতং পিতা।
সহস্রন্তু পিতৃন্মাতা গৌরবেনা তিরিচ্যতে ॥

(মনু ২/১৪৫)।

অর্থাৎ দশজন উপাধ্যায় অপেক্ষা একজন আচার্যের গৌরব অধিক, একশত আচার্যের গৌরব অপেক্ষা পিতার গৌরব অধিকতর; সর্বোপরি সহস্র পিতা অপেক্ষা মাতা বেশি সম্মানের। যে সনাতন ধর্ম জ্ঞানদাতা গুরুকে সমাজের শীর্ষে স্থান দিয়েছে, সেই ধর্মই জননীকে কোথায় স্থান দিয়েছে কল্পনা করুন।

প্রশ্ন : ৩৫১ ॥ অনেকের মুখেই শুনি শ্রী কৃষ্ণ দুর্যোধনের অহংকারের জন্য তার আতিথ্য গ্রহণ না করে মহামতি বিদুরের গৃহে খুদকুড়া গ্রহণ করেছিলেন। একথা কি সত্য?

উত্তর : প্রথমটি সত্য। কারণ ভগবান কৃষ্ণ পাণ্ডব এবং কৌরবদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য দূত হিসাবে কৌরব সভায় উপস্থিত হলেও তাঁকে কৌরবরা যথাযোগ্য মর্যাদাদান এবং তাঁর উপদেশ না মানায় তিনি দুর্যোধনের আতিথ্য স্বীকার না করে বিদুরের গৃহে গমন করেন। সেখানে বিদুর প্রভূত অন্নপানাদি দ্বারা কৃষ্ণকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। প্রথমে অন্নপানাদি দ্বারা কৃষ্ণ সমবেত ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করেন। পরে সাত্যকি, কৃতবর্মা প্রমুখ পরিজনদের নিয়ে কৃষ্ণ সেই পবিত্র উপাদেয় খাদ্যাদি ভোজন করেছিলেন (মহাভারত উদ্যোগপর্ব)। এথেকে জানা যায় বিদুর গরীব ছিলেন না। গরীব থাকার কথাও নয়। কারণ তিনি ধৃতরাষ্ট্রের একজন অমাত্য বা মন্ত্রী ছিলেন।

প্রশ্ন : ৩৫২ ॥ অর্জুন পূর্বজন্মে কে ছিলেন? তিনি কোথায় এবং কোন্ সময়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : অর্জুন ছিলেন ইন্দ্রের ঔরসে মহারাজ পাণ্ডুর তৃতীয় ক্ষেত্রজ পুত্র। তিনি পূর্বজন্মে নর নামক ঋষি ছিলেন। নারায়নের সাথে তিনি বদরিকা আশ্রমে তপস্যা করতেন। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দিনের একবিশংদণ্ডের (১ দণ্ড = ২৪ মিনিট) সময় শতশৃঙ্গ পর্বতে অর্জুনের জন্ম হয়।

প্রশ্ন : ৩৫৩ ॥ অর্জুনের দশটি নাম ছিল। এগুলোর কারণ কি ছিল?

উত্তর : মহাভারতের বিরাট পর্বে উল্লেখ আছে—

অর্জুনঃ ফাল্গুনো জিষ্ণুঃ কিরীটী শ্বেতবাহনঃ।
বীভৎসুর্বিজয়ঃ কৃষ্ণ সব্যসাচী ধনঞ্জয় ॥

(মহাভারত, বিরাটপর্ব ৪৪/৯)।

বহুজনপদ জয় করে ধন আহরণ করতেন বলে তাঁর নাম ধনঞ্জয়। যুদ্ধে জয় লাভ না করে ফিরে আসতেন না বলে তার নাম ছিল বিজয়।

তার রথের অশ্বগুলি শ্বেত (সাদা) বর্ণের হওয়ায় একনাম শ্বেত বাহন। জন্মদিনে নক্ষত্র ছিল উত্তর ফাল্গুনী। এই জন্য এক নাম ফাল্গুনী। দেবরাজ দানবদের সাথে যুদ্ধ করার সময় তাকে একটি কিরীট প্রদান করায় তার এক নাম কিরীটী। যুদ্ধক্ষেত্রে কোন বিভৎস কাজ করতেন না বলে তার নাম ছিল বীভৎসু। উভয় হস্তে সমানভাবে গাণ্ডীব ধনু চালনা করতে পারতেন বলে এক নাম সব্যসাচী। শুভ কর্মে রুচি ছিল বলে তার নাম হয় অর্জুন। তিনি খুব বীর পুরুষ ছিলেন। তাই একনাম জিষ্ণু। গায়ের বর্ণ কৃষ্ণ অথচ উজ্জল ছিল। তিনি সকলের মন আকর্ষণ করতে পারতেন। সেজন্য তার পিতা নাম রাখেন কৃষ্ণ। এটিই ছিল তার আসল নাম।

প্রশ্ন : ৩৫৪ ॥ অর্জুনকে গুড়াকেশ বলা হতো। কেন?

উত্তর : অর্জুন নিদ্রাকে জয় করতে পেরেছিলেন। এই হেতু তাকে গুড়াকেশ বলা হতো।

প্রশ্ন : ৩৫৫ ॥ অর্জুনের ধনু এবং শঙ্খের নাম কি ছিল? এগুলো কে অর্জুনকে দিয়েছিলেন?

উত্তর : অর্জুনের ধনুকের নাম ছিল গাণ্ডীব। এই ধনুক গণ্ডারের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা নির্মিত বলে এর নাম গাণ্ডীব ছিল। বরুনদেব এই ধনু প্রদান করেন। অর্জুনের শঙ্খের নাম ছিল দেবদত্ত। খাণ্ডব বন দহনের সময় অর্জুন দানবদের শিল্পী ময়দানবকে জীবনদান করেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ময়দানব কৈলাস পর্বতের বিন্দু সরোবর থেকে আহরণ করে দেবদত্ত নামক শঙ্খ অর্জুনকে উপহার দেন।

প্রশ্ন : ৩৫৬ ॥ অর্জুন এক সময় তাকে প্রদত্ত গীতার উপদেশসমূহ ভুলে যান। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কৃষ্ণের দ্বারকাযাত্রার সময় পুনরায় সেইভাবে উপদেশ কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করায় কৃষ্ণ তাকে কি বলেছিলেন?

উত্তর : কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি যোগযুক্ত হয়ে তোমাকে পরব্রহ্মের তত্ত্ব উপদেশ দিয়েছিলাম। পুনরায় ঠিক সেইভাবে বিশদভাবে বলা সম্ভব নয়। এরপর কৃষ্ণ প্রাচীন ইতিহাস, এবং রূপকের মাধ্যমে (অশ্বমেধ পর্ব

১৬-৫১ অধ্যায়) ছত্রিশ অধ্যায় ব্যাপিয়া (অনুগীতা, ব্রাহ্মণ গীতা ও গুরুশিষ্য সংবাদ) অর্জুনকে গীতাতত্ত্বের উপদেশ দেন। তারপর তিনি দ্বারকা যাত্রা করেন।

প্রশ্ন : ৩৫৭ ॥ পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথে অর্জুনের কেন পতন হয়েছিল?

উত্তর : মহাপ্রস্থানের পথে ক্রমশঃ দ্রৌপদী, সহদেব এবং নকুলের পতন হয়। এরপর অর্জুনের পতন হয়। কি দোষে অর্জুনের পতন হলো ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন : অর্জুন একদিনে শত্রুগণকে বিনাশ করবেন এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যা তিনি রক্ষা করতে পারেন নাই। আবার নিজেকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বলে মনে মনে অহংকার করতেন। এইসব দোষে তার পতন হয়েছে।

প্রশ্ন : ৩৫৮ ॥ অভিমন্যু কে ছিলেন? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি কিভাবে নিহত হয়েছিলেন? অভিমন্যুর পুত্রের নাম কি?

উত্তর : সোমপুত্র বর্চ্চাঃ পরজন্মে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুরূপে জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁর নামই অভিমন্যু (মহাভারত আদিপর্ব ৬৭/১১২)। কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা অভিমন্যুর জননী। তিনি একজন মহারথ ছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ত্রয়োদশ দিনে সেনাপতি দ্রোন চক্রব্যূহ নির্মাণ করে যুদ্ধারম্ভ করেন। কর্ণ, দুঃশাসন, কৃপাচার্য, দুর্যোধন, দ্রোনাচার্য, অশ্বত্থামা এবং জয়দ্রথ—এই সাতজন রথী এই ব্যূহে অবস্থান করে পাণ্ডবপক্ষের অসংখ সৈন্য বিনাশ করতে থাকেন। তখন যুধিষ্ঠিরের পরামর্শে অভিমন্যু সেই ব্যূহ ভেদ করে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ঐ সময় উপরোক্ত সাতজন রথী একযোগে অভিমন্যুকে আক্রমণ করে নিহত করেন। তিনি দুঃশাসনের গদার আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন : ৩৫৯ ॥ অজ্ঞাতবাসের সময় পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদী কোন্ রাজ্যে এবং কি কি নামে আত্মগোপন করেছিলেন?

উত্তর : পঞ্চপাণ্ডবসহ দ্রৌপদী বার বছর বনবাসে ছিলেন। ত্রয়োদশ বছরে অজ্ঞাতবাসের জন্য তারা মৎস রাজ্যকে মনোনীত করেছিলেন। বিরাট নামে এক রাজা ছিলেন মৎস দেশের অধিপতি।

পাণ্ডবরা ছদ্মবেশে মৎসরাজ্যে প্রবেশ করেন। সেখানে যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে রাজার সভাসদ হন। ভীমসেন বল্লভ নামে পাচক, অর্জুন বৃহন্নলা রূপে, নকুল গ্রন্থিক নামে ও সহদেব তন্তিপাল রূপে এবং দ্রৌদপী সৈরিন্ধ্রী নামে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন : ৩৬০ ॥ অদ্বৈত আচার্য প্রভুর পদকমলে কতটি শুভ চিহ্ন আছে এবং সেগুলো কি কি?

উত্তর : অদ্বৈত প্রভুর ডান পদকমলে ৪টি শুভ চিহ্ন আছে। এগুলো হল : বৃদ্ধাঙ্গুলির নিচে একটি যবচিহ্ন এবং তার নিচে একটি চক্র আছে। বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং তর্জনীর মাঝখানে পদকমলে অধাংশ জুড়ে একটি রেখা আছে। আবার অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাঝখান থেকে আরম্ভ হয়ে একটি দড়ি (rope) পদকমলের অর্ধেক পর্যন্ত প্রসারিত আছে।

প্রভুর বাম পদকমলেও ৪টি শুভ চিহ্ন আছে। সেগুলো হল : বৃদ্ধাঙ্গুলির নিচে একটি শঙ্খ। মধ্যমার নিচে একটি ত্রিভুজ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিচে রয়েছে গরুর খুর। গোড়ালিতে রয়েছে একটি মৎস।

প্রশ্ন : ৩৬১ ॥ অদ্বৈত আচার্য প্রভুর করকমলে কতটি মাঙ্গলিক চিহ্ন আছে এবং সেগুলি কি কি?

উত্তর : অদ্বৈত প্রভুর ডান করকমলে ৩টি শুভচিহ্ন আছে। এগুলো হল ঃ প্রতিটি আঙ্গুলের অগ্রভাগে একটি করে শঙ্খ আছে। তর্জনীর নিচে একটি পতাকা এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিচে রয়েছে একটি ত্রিভুজ।

বাম করকমলে আছে ৩টি মাঙ্গলিক চিহ্ন। সেগুলো হল : প্রতিটি আঙ্গুলের অগ্রভাবে একটি করে শঙ্খ আছে। তর্জনীর নিচে আছে একটি ডমরু। আর নিচ দিকে রয়েছে একটি পদ্ম।

প্রশ্ন : ৩৬২ ॥ সন্ধ্যাবন্দনা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : শ্রী গুরুদেব শিষ্যকে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করেন। প্রতিদিন সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিটি ১০ বার করে জপ করতে হয়। একেই সন্ধ্যাবন্দনা বলে। সকালে এবং দুপুরে পূর্বমুখী এবং সন্ধ্যাকালে উত্তরমুখী হয়ে এই মন্ত্র একান্তমনে নীরবে জপ করতে হয়। এইভাবে গায়ত্রীমন্ত্র জপকেই সন্ধ্যাবন্দনা বলা হয়।

প্রশ্ন : ৩৬৩ ॥ সংসার অসার জেনেও মানুষ ভক্তসঙ্গ করে না কেন?

উত্তর : পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে বদ্ধ জীব ভক্তসঙ্গ করতে পারে না। ভক্তসঙ্গ তাদের কাছে ভালোও লাগে না। বৃহৎ নারদীয় পুরানে বলা হয়েছে যাদের ইন্দ্রিয় সংযত নয়, যারা পাপাচারী, যাদের চিত্ত শুদ্ধ নয় তারা ভক্ত সঙ্গ লাভের সুযোগ পায় না। কেবলমাত্র পুণ্যবান মানুষই ভগবৎ ভক্তের সঙ্গলাভের জন্য যত্ন করে, অভক্তরা নয়।

প্রশ্ন : ৩৬৪ ॥ সকাম কর্ম কি? সকাম কর্মের গতি কি?

উত্তর : সত্ত্ব-রজ-তম গুণে থেকে যে সব কর্ম করা হয় তাই হল সকাম কর্ম। অন্যকথায় জড় জাগতিক ভোগবাসনা চরিতার্থ করার জন্য যে কর্ম সম্পাদন করা হয় তাকে সকাম কর্ম বলে।

সকাম কর্মেই জড় জীবের জড় বন্ধন হয়। জড়াপ্রকৃতির তিনটি গুণে জড়িত হয়ে মানুষ সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়। সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি গুণ আছে। সত্ত্বগুণে আবিষ্ট হয়ে কর্ম করলে মানুষের স্বর্গ লাভ হয়। রজোগুণ সম্পন্ন কাজ করলে নরলোক—অর্থাৎ এই মর্তলোকেই থাকতে হয়। আর তমোগুণের কাজ করলে নরকে গতি হয়।

সকাম কর্ম করলে মানুষ ব্রহ্মলোক থেকে শুরু করে সমস্ত লোকে বার বার যাতায়াত করতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন : ৩৬৫ ॥ স্ত্রীয়াশ্চরিএম দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যা—কথাটি কি সঠিক?

উত্তর : এর অর্থ হল স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারাও জানতে পারেন না, মানুষতো দুরের কথা। কথাটি মূলত যৌন শাস্ত্রের প্রেক্ষিতেই সমাজে প্রচলিত হয়েছে। এই শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে নারী ষোড়শকলার অধিকারিনী। তারা পুরুষদের যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় তাদের ছলা, কলা এবং চাতুরী দ্বারা ভূলিয়ে দিতে পারে। এমনকি দেবতারাও নারীদের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে পড়েন। এসব কিছুই ধর্মহীন নারীদের বেলায় প্রযোজ্য। যে সব স্ত্রীলোক ভগবানের শরনাগত তাদের বেলায়

উপরোক্ত কথা কোনক্রমেই প্রযোজ্য নয়। কারণ তাদের মধ্যে পুরুষদেরকে প্রতারণা, ছলনা, সৌন্দর্যে মোহিত করা এসব বদগুণ থাকে না।

প্রশ্ন : ৩৬৬ ॥ সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন বলতে কি কি জিনিস বুঝানো হয়?

উত্তর :

১. জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস—এই হল ভগবানের সাথে জীবের সম্বন্ধ বা সম্পর্ক।
২. অভিধেয় শব্দটি দ্বারা ভগবানের সাথে জীবের সম্বন্ধ কি উপায়ে হতে পারে তা বুঝানো হয়। শ্রবণ-কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, বন্দনা ইত্যাদি নয় উপায়ে এই সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।
৩. প্রয়োজন দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ বুঝানো হয়। অর্থাৎ কেবল ভক্তির দ্বারাই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা সম্ভব—প্রয়োজন শব্দটি দ্বারা তাই বুঝানো হয়।

প্রশ্ন : ৩৬৭ ॥ স্যমন্তক মনি কি?

উত্তর : দ্বাপর যুগে দ্বারকা নগরীতে সত্রাজিত নামে এক ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি ছিলেন সূর্য ভক্ত। সত্রাজিতের ভক্তিতে প্রসন্ন হয়ে একদিন সূর্যদেব তাকে একটি মণি প্রদান করেন। একেই স্যমন্তক মনি বলা হয়। এই মনি হল এক বিরল এবং অদ্ভুত মনি। এথেকে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণে স্বর্ণের সৃষ্টি হতো। আবার যথার্থভাবে এই মনির পুজার্চনা হলে সেখানে কোন বিপদআপদ হতো না।

প্রশ্ন : ৩৬৮ ॥ সনাতন গোস্বামীজী বৃদ্ধকালে একটি শিলাখণ্ডকে চারবার প্রদক্ষিন করতেন। এতেই তাঁর গিরিগোবর্ধন পরিক্রমা হয়ে যেত। এই শিলাটির কি এত গুণ ছিল?

উত্তর : বৃদ্ধ বয়সে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর পক্ষে প্রতিদিন গিরিগোবর্ধন পরিক্রমা করা খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই ভগবান শ্রী কৃষ্ণ সনাতন গোস্বামীর কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন যে তিনি বৃদ্ধ

হওয়ায় প্রতিদিন তাঁর গিরি গোবর্ধন পরিক্রমার দরকার নেই। কিন্তু গোস্বামীজী এই পরিক্রমা বন্ধ করতে রাজি না হওয়ায় ভগবান শ্রী কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত থেকে একখণ্ড পাথর বা শিলা নিয়ে আসবার জন্য তাকে বললেন। গোস্বামীজী তা আনার পর কৃষ্ণ ঐ শিলাখণ্ডের উপর দাড়িয়ে বাঁশী বাজালে কাছাকাছি থাকা একটি গোবৎস বা বাছুরকে তা আকর্ষণ করে এবং শিলাখণ্ডটি গলতে শুরু করে। ফলে শিলাখণ্ডটির উপর শ্রী কৃষ্ণের পাদপদ্মের এবং বাছুরটির খুরের ছাপ থেকে গেল। শ্রী কৃষ্ণ তখন সনাতন গোস্বামীকে বললেন যে চারবার এই শিলাখণ্ডটা প্রদক্ষিণ করলেই তা একবার গোবর্ধন পর্বত পরিক্রমার সমান হবে।

প্রশ্ন : ৩৬৯ ॥ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রথমে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণের কথা কেন শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে? অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের কথা কেন নয়?

উত্তর : সমস্ত ধরনের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বাকে লোভময় সুদুর্মতি বলা হয়েছে। জিহ্বা বা রসনা দ্বারাই জড়জগতে আমরা যেসব খাদ্য গ্রহণ করি সেগুলোর স্বাদ পাই। লোভনীয় সব খাবার গ্রহণে জিহ্বাই আমাদেরকে প্ররোচিত করে। জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে রজ এবং তমোগুণ সম্পন্ন আহার গ্রহণের প্রবণতা সৃষ্টি হবে। এতে উদরের বেগ সৃষ্টি হবে। তা থেকে মনের বেগ, চোখের বেগ, উপস্থের বেগ সৃষ্টি হবে। পরিণামে জড়জাগতিক অশান্তি ভোগ। আবার এই ধরনের খাদ্য খেলে জীব মনুষ্য দেহ থেকে নিম্নস্তরের দেহ ধারনে পরবর্তী জন্মে বাধ্য হবে। এককথায় জিহ্বার বেগ দমন না করতে পারলে পরিণামে ৮০ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করতে হয়। এজন্য সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বাকেই প্রথমে নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ৩৭০ ॥ সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশের জন্য আগের তিনটি আশ্রমে অবস্থান করা কি অত্যাবশ্যক?

উত্তর : সমাজে শৃঙ্খলা, কর্তব্য এবং ধর্মীয় চেতনা সংরক্ষণের জন্য মুনি ঋষিরা একের পর একটি আশ্রমের কথা বলেছেন। তাই

সাধারণ মানুষের জন্য সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশের আগে আগের তিনটি আশ্রম প্রয়োজন পরিপক্কতা অর্জনের জন্য।

তবে এমন ভাগ্যবানও মনুষ্যকূলে জন্ম নেন যারা পূর্বজন্মের সংস্কার এবং সুকৃতির কারণে সহজাত বৈরাগ্য নিয়েই এই জড়জগতে আসেন। যেমন শুকদেব গোস্বামী। তিনি উপনয়নের আগেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন (ভাগবত ১/২)। জন্মাবধি উলঙ্গ ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান পর্যন্ত হয় নাই (ভাগবত ৪/৫)। শ্রী বুদ্ধদেব এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভু গার্হস্থ্য আশ্রম থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য আট বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাই যার মনে যথার্থই বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় তার পক্ষে যে কোন সময়ই সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার আছে।

প্রশ্ন : ৩৭১ ॥ সনাতন ধর্মে জ্ঞান (Knowledge) বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : প্রচলিত মতে যে কোন বিদ্যার্জনের নামই জ্ঞান লাভ। কিন্তু সনাতন ধর্মে জ্ঞান বলতে কোন ব্যবহারিক তত্ত্ব আহরণ করা বুঝায় না। যাঁকে জানলে অন্য সব কিছুই জানা হয়ে যায় সেই পরমেশ্বর ভগবানকে জানা বা তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারাই হল প্রকৃত জ্ঞান। যে পদ্ধতিতে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা বা উপলব্ধি করা যায় তাকে পরা বিদ্যা বা জ্ঞান বলা হয়।

প্রশ্ন : ৩৭২ ॥ সনাতন ধর্মে অহিংসার কথা বলা হয়েছে। এটি কি প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা বুঝায়?

উত্তর : সনাতন ধর্মে অহিংসার অর্থ ব্যাপক। কেবলমাত্র খাদ্য বা শিকারের উদ্দেশ্যে প্রাণীবধ থেকে বিরত থাকা নয়। অহিংসার অর্থ সর্বভূতের (মানুষ, পশু বা হীনতর প্রাণী) প্রতি শত্রুভাব এবং এমনকি ঘৃনার ভাব, কারোও অনিষ্ট করার চিন্তা পর্যন্ত ত্যাগ করা বুঝায়।

সনাতন ধর্মের এই অহিংস মতবাদ বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরমাত্মা সর্বজীবের অন্তরে আছেন—এই সমদর্শন যার উপলব্ধি হয় তিনি অহিংস। কারণ তখন তিনি অনুভব করতে পারবেন যে অপর

কোন জীবকে হত্যা ও হিংসা করলে তার অর্থ নিজের আত্মাকেই হিংসা করা বুঝাবে। অহিংস ব্যক্তির দেহাত্মবোধ থাকে না। তাই শত্রুমিত্র ভেদ জ্ঞানও থাকে না। তিনি সবার প্রতি মিত্রভাবাপন্ন এবং সকলের দুঃখে সমব্যথী হন। যারা সব না জেনে সনাতন ধর্মের সমালোচনা করেন, তারা কি অপর কোন ধর্মের উল্লেখ করতে পারবেন যেখানে অহিংসাকে এর চেয়ে ব্যাপকতর অর্থ এবং উচ্চতর মর্যাদা প্রদান করেছে?

প্রশ্ন : ৩৭৩ ॥ স্বাধ্যায় দ্বারা শাস্ত্রে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : স্বাধ্যায় শব্দটির সাধারণ অর্থ হল নিজে পাঠ করা। শাস্ত্রে বেদ অধ্যয়ন এবং আবৃত্তিকে স্বাধ্যায় বলে। উপনিষদ বলেন, আত্মাকে দর্শন করতে হলে শ্রবণ, মনন, ধ্যান—পর্যায়ক্রমে এই তিনটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। গীতায়ও (গীতা ৪/২৮) স্বাধ্যায়ের উপর গুরুত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ বার বার শাস্ত্র পাঠ করলে সন্দেহ দূর হয়ে ভগবানে নিষ্ঠা বা একাগ্রতার উদয় হয়। এটি বাঙ্ময় তপস্যার অন্যতম এবং দৈবী সম্পদ মোক্ষ লাভের অন্যতম উপায় বা উপকরণ। আগের কর্মের সুকৃতি অনুযায়ী যে সব দৈবী সম্পদ জাতকের অর্জিত হয় তার মধ্যে স্বাধ্যায় অন্যতম (গীতা ১৬/১, ৫)। শাস্ত্রসম্মত কাজই উত্তম। এই জন্য ভগবানের কৃপা লাভের জন্যও শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত।

প্রশ্ন : ৩৭৪ ॥ সনাতন ধর্মে কাম বলতে কি বুঝানো হয়? এই কাম থেকে মুক্ত থাকার সর্বোৎকৃষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত উপায় কি?

উত্তর : সাধারণ অর্থে কাম শব্দটি দ্বারা যৌন লালসা বুঝানো হয়। কিন্তু উপনিষদ, গীতা, ভাগবতসহ সনাতন শাস্ত্রের সকল ধর্মগ্রন্থেই কাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু নারী জগতে ইন্দ্রিয়ভোগ্য যত বিষয় এবং বস্তু আছে সেগুলি পাওয়ার ইচ্ছা বা বাসনাকেই কাম বলা হয়। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে **আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।**

এই কাম থেকে মুক্ত থাকার সর্বোৎকৃষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত উপায় হল প্রেম ভক্তি যোগে ভগবানকে সেবা করতে হবে। **কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা** থাকতে হবে। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মাধুর্য—এদের যে কোন একটি উপায়ে নিরন্তর ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত থাকতে পারলেই জড় কামনা-বাসনা থেকে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন : ৩৭৫ ॥ সনাতন ধর্মে দান করার উপদেশ আছে। তাহলে যে কোন লোককে দান করলেই কি চলবে?

উত্তর : বৃহদারন্যক উপনিষদে ব্রহ্মা তাঁর অন্যতম সন্তান মানুষকে দান করার উপদেশ দিয়েছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে দানকে ধর্মের প্রথম সোপান বলা হয়েছে। ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে যে ত্যাগ ধর্মের কথা বলা হয়েছে দান তার একটি অন্যতম প্রধান অঙ্গ। মনুসংহিতায় দানকে কলিযুগের ধর্ম বলা হয়েছে।

কিন্তু যথেচ্ছ দান শাস্ত্রে অনুমোদন করা হয় নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদ এবং গীতাসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে দানের ক্ষেত্রে কিছু অনুশাসন মেনে চলার উপদেশ দেয়া হয়েছে।

১. কেবলমাত্র ন্যায়পথে থেকে অর্জিত ধন দানের যোগ্য। ডাকাতি করে দরিদ্রকে পোষণ করলে তা দান হবে না।
২. শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে দান করতে হবে। গীতা বলেন অশ্রদ্ধার দান না ইহলোকে না পরলোকে, কোন ফলই দিবে না (গীতা ১৭/২৮)।
৩. সামর্থ অনুসারে দান করতে হবে।
৪. বিনম্রভাবে দান করা উচিত। অর্থাৎ দান করার সময় যেন অহংকার বা ধনগর্বের উদয় না হয়।
৫. দানের গ্রহীতাকে মিত্রবোধে দান করতে হবে।
৬. অযোগ্য বা অনধিকারী ব্যক্তিকে (যেমন মদ্যপ, দুশ্চরিত্র, ভগবৎ বিদ্বেষী) দান করা অনুচিত।

অশাস্ত্রীয় দান (যেমন ধর্মত্যাগী ব্যক্তিকে) মোক্ষের অনুকূল হওয়াতো দূরের কথা, নরকের কারণ হতে পারে (মহাভারত শান্তি পর্ব ২৬/৯)।

প্রশ্ন : ৩৭৬ ॥ স্ত্রীলোকদের মনে কোন গোপন কথাই থাকে না—এরূপ প্রবাদ আছে এবং বাস্তবেও দেখা যায়। এর কোন শাস্ত্রীয় কারণ আছে কি?

উত্তর : মহাভারতের স্ত্রীপর্ব থেকে দেখা যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মৃত বীরগণের সৎকারের সময় কুন্তী সহসা পুত্রদের কাছে উপস্থিত হয়ে কেঁদে কেঁদে কর্ণের যথার্থ পরিচয় দিয়ে তার উদ্দেশ্যে তর্পন করার জন্য তাদেরকে অনুরোধ করেন। কর্ণ তাদেরই জেষ্ঠ্য তাই ছিলেন—মার মুখে একথা শুনে পাণ্ডবগণ শোকে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। এই পরিচয় গোপন রাখার জন্য যুধিষ্ঠির করুন বিলাপ করে স্ত্রীজাতিকে অভিশাপ দেন—

অতো মনসি যদ্ গুহ্যং স্ত্রীণাং তন্ন ভবিষ্যতি

(মহাভারত স্ত্রীপর্ব ২৭/২৯)

অর্থাৎ এখন থেকে স্ত্রীলোকের মনে কোন গুহ্য বা গোপন কথা থাকবে না।

প্রশ্ন : ৩৭৭ ॥ সহদেবের কতজন স্ত্রী এবং পুত্র ছিল? তার শঙ্খের নাম কি ছিল? মহাপ্রস্থানের পথে সহদেবের পতন হয়েছিল কেন?

উত্তর : সহদেবের তিনজন স্ত্রী ছিল : দ্রৌপদী, মদ্ররাজের কন্যা বিজয়া এবং জরাসন্ধের এক দুহিতা। দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতকর্মা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। বিজয়ার গর্ভজাত পুত্রের নাম ছিল সুহোত্র। সহদেবের শঙ্খের নাম ছিল মনিপুষ্পক।

মহাপ্রস্থানের পথে দ্রৌপদীর পতনের পরই সহদেবের পতন হয়। ভীম সহদেবের পতনের কারণ সম্পর্কে যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করায় যুধিষ্ঠির বলেছিলেন, সহদেব কাউকেই নিজের মত প্রজ্ঞানী ও পণ্ডিত মনে করতেন না। এই দোষেই তার পতন হয়।

প্রশ্ন : ৩৭৮ ॥ সহদেব এবং নকুলের মামা হয়েও শল্য রাজা কেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান করেছিলেন?

উত্তর : শল্য ছিলেন দুর্বল চিত্তের মানুষ। তিনি অনেকটা লোভী এবং অপরের প্রশংসার পাত্র ছিলেন। শল্য পাণ্ডবদের আমন্ত্রণে প্রচুর সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেন। হস্তিনার কাছে একসময় সৈন্যসহ বিশ্রাম করছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে দুর্যোধন তার সম্মানার্থে নানা ধরনের আয়োজন করে তাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা জানান। এতে শল্য খুশি হয়ে দুর্যোধনের মনোবাসনা পূরণের আশ্বাস দিলে দুর্যোধন তাকে তার সৈন্যদের সেনাপতি হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। শল্য এতে সম্মত হন। এভাবে তিনি কুরুপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ৩৭৯ ॥ সীতার পদযুগল ব্যতীত লক্ষ্মণ নাকি তার মুখের দিকে কখনো তাকাতেন না। এই কথা কি সত্য?

উত্তর : লক্ষ্মণ ছিলেন রাম ও সীতার একান্ত অনুগত। উভয়েরই সেবা করা ছিল লক্ষ্মনের একমাত্র ব্রত। সীতা একবার তাঁকে কটুবাক্য বলা সত্ত্বেও তিনি তার প্রতিবাদ করেন নাই। সীতা হরণের পর রাম ও লক্ষ্মণ সীতার খোজ করতে করতে একসময় ঋষ্যমুখ পর্বতে সুগ্রীবের দেখা পান। সুগ্রীব তাদেরকে এক রমণীর পরিত্যক্ত কিছু অলঙ্কার দেখান। সেগুলো পাওয়ার পর রাম লক্ষ্মণকে বলেন যে দেখতো এগুলো সীতার কিনা? তার উত্তরে লক্ষ্মণ বলে ছিলেন : "আমি কেয়ুর দুটি চিনতে পারব না, কুণ্ডল দুটিও চিনতে পারবো না। তার নুপুর দুটি চিনতে পারছি। নিত্য পাদস্পর্শ করবার সময় তাদের দেখেছি।" কেয়ুর হল বাজু, বাহুর ভূষণ। কুণ্ডল কানের ভূষণ। তিনি সেগুলো চিনার ক্ষমতা রাখেন না। কারণ তিনি সীতার বিভিন্ন অঙ্গের প্রতি কখনো দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। নূপুর তাঁর দৃষ্টিগোচর হতো সীতাকে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করার সময়।

প্রশ্ন : ৩৮০ ॥ সন্ন্যাসী কে? সন্ন্যাসীর জন্য কি বিশেষ ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ পড়া অত্যাবশ্যক?

উত্তর : সন্ন্যাস শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ সৎ-ন্যাস থেকে। সৎ মানে হল পরম ব্রহ্ম এবং ন্যাস-এর অর্থ হল পরিত্যাগ করা। যিনি

পরমেশ্বরের সেবার জন্য সবকিছু ত্যাগ করেছেন তাকে সন্ন্যাসী বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট ধরনের পোষাক পরিধান অথবা একটি নির্দিষ্ট ধরনের দাড়ি রাখলেই কোন ব্যক্তি সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন না। ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপা শ্রীমূর্ত্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন : "এমনকি আপনার সাধারণ পোষাক-কোট এবং প্যান্টেও আপনি সন্ন্যাসী হতে পারেন। সেটি কোন ব্যাপার নয়। আপনাকে শুধু আপনার জীবন ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করতে হবে। তাকেই বলা হয় সন্ন্যাস। ভগবদ গীতায় (৬/১) পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে জড় কর্মফলের আশা না করে যিনি কর্তব্য কর্ম করে যান তিনি একজন সন্ন্যাসী।"

প্রশ্ন : ৩৮১ ॥ মায়াদেবীর হাত থেকে মুক্তির উপায় কি?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ গীতায় (৭/১৪) বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

অর্থাৎ আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রম্য। কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করেন তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন। ভগবানের অংশ হলেও জীব তাঁকে ভুলে গিয়ে জড়জগতের সত্ত্ব, রজ এবং তমোগুণ দ্বারা মোহিত হয়ে সংসারের দুঃখ কষ্ট ভোগ করে।

কৃষ্ণ ভুলি যেই জীব ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥

তাই মায়াদেবীর হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবানই বলেছেন **মামেব যে প্রপদ্যন্তে**—অর্থাৎ আমার চরণে যে আশ্রিত বা শরনাগত হয়, **মায়ামেতাং তরন্তিতে**—অর্থাৎ তাকে আমি মুক্তি প্রদান করি। এজন্যই বৈষ্ণব আচার্যগণ বলেন—

সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোমুখ হয়।
তবে সেই নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

তবে দুর্দশাগ্রস্ত কলিজীবের প্রতি করুনাপরবশ হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাদের মুক্তির সহজ পথ দিয়ে গিয়েছেন কেবলমাত্র হরিনাম সংকীর্তন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্র জপ, কীর্তন এবং প্রচারের মাধ্যমে নিজেকে শুদ্ধ এবং পবিত্রময় করে তোলা যায়। এই নাম থেকেই সর্বসিদ্ধি হবে। আর এই নাম বলেই মায়া দেবীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন : ৩৮২ ॥ মলমাসে কোন শুভকর্ম করতে নেই—একথা কতদুর সত্য?

উত্তর : স্মার্ত ব্রাহ্মণেরা বলেন মলমাস বা অধিমাসে কোন শুভকর্ম করা উচিত নয়। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের কাছে এই মলমাসই পুরুষোত্তম মাস নামে পরিচিত। এই মাস কৃষ্ণ ভজনের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। শ্রী নারদীয় পুরানে ভগবান বলেছেন নিষ্কাম বা সর্বকাম হয়ে যিনি এই মাসের পুজা করেন তিনি সব জড় কর্মফল ভস্মীভূত করে আমাকে প্রাপ্ত হন। যে সব মুর্খ এই মাসে ভগবানের নাম জপ করে না, ভক্তগণকে সাধ্যমত দ্রব্যাদি দান করে না, ভগবদ্‌ভক্তি অনুশীলন করে না, প্রাতঃ স্নান করে না, আরাধ্য দেবের স্তুতি করে না, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ করে, ভগবৎ ধামের অবমাননা করে, সেই সব দুষ্টজনেরা জীবনধারণের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকবে এবং কোন অবস্থায়ই বিন্দুমাত্র সুখ পাবে না।

শ্রী ভগবান বলেছেন এই পুরুষোত্তম মাসে যে আমাকে ভক্তিসহকারে অর্চন করে, সে ধন-পুত্রাদি সুখ-ভোগ করে অন্তিমে আমার গোলোক ধামে বাস করবে।

প্রশ্ন : ৩৮৩ ॥ মায়াবদ্ধ জীবকে নিত্যবদ্ধ জীব বলা হয়। এরা কি কখনো মুক্ত হতে পারবে না?

উত্তর : মায়াদেবীর কবলে পড়ে যে সকল জীব অনন্তকাল ধরে এই জড়সংসারে আবদ্ধ থাকে তাদেরকে নিত্যবদ্ধ জীব বলা হয়। এরা অসংখ্যবার জন্ম ও মৃত্যুর কবলে থেকে বহুযোনি পরিভ্রমণ করতে থাকে। আর বার বার জড়জগতের ত্রিতাপ জ্বালা ভোগ করে চলে।

ষড়রিপুর বশীভূত হয়ে মায়া-পিশাচীর লাথি খেতে থাকে। এরাই নিত্যবদ্ধ জীব।

জড় সংসারে ভ্রমণ করতে করতে কখনো যদি ভক্তসঙ্গের সুযোগ পায় তখন তার কৃপায় সে ভগবৎভক্তি অনুশীলন করা আরম্ভ করে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন—

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায় ॥
তাঁর-উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥

(চৈ. চ. মধ্য ২২/১৪-১৫)

প্রশ্ন : ৩৮৪ ॥ মালা জপার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় আছে কি? থাকলে বলবেন।

উত্তর : দুভার্গবশত অনেক কৃষ্ণ ভক্তই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কর্তব্যটিকে গৌন করে তোলেন। তারা মনে করেন মালা জপার জন্য সারাদিনতো হাতে আছেই। একসময় করলেই চলবে। এতে মালা জপা এক সময় তার কাছে তুচ্ছ কাজে পরিণত হতে পারে। শ্রী কৃষ্ণের দিব্য নাম জপ দৈনন্দিন ভক্তি অনুশীলনের এক আবশ্যকীয় অঙ্গ। অন্য কিছু করার আগে এই কাজটিই সমাধা করা উচিত। বৃন্দাবনে এমন অনেক বৈষ্ণব আছেন যাঁরা ৬৪ মালা জপের আগে একবিন্দু জলও পান করেন না। এজন্য দিনের প্রথমভাগেই কমপক্ষে ১৬ মালা জপ করে নেয়া উচিত।

প্রশ্ন : ৩৮৫ ॥ মহাপ্রভুর কোন্ ভক্ত উচ্চস্বরে নাম কীর্তন করতেন? কোন্ পার্ষদ হুঙ্কার দিয়ে তাঁকে এই জগতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আহ্বান করেছিলেন?

উত্তর : মহাপ্রভুর পরম ভক্ত শ্রীল শ্রীধর ঠাকুর (কলা-মূলা বেচার শ্রীধর) রাত্রিবেলা উচ্চস্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করতেন। তার এই কীর্তন শুনে তৎকালীন ভগবৎ বিদ্বেষীরা মনে করতেন যে ক্ষুধার জ্বালায় চাষাবেটা শ্রীধর চীৎকার করছে।

মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য প্রভু কলিযুগের পাপাচারী মানুষদেরকে উদ্ধার করার জন্য ভগবানকে এই জড়জগতে অবতরণ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৩৮৬ ॥ মানসিক শান্তি পাওয়ার উপায় কি? কে মানসিক শান্তি দিতে পারে?

উত্তর : কেউ যদি তার মনকে পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে নিবিষ্ট করতে পারে তাহলে সে অবশ্যই মানসিক শান্তি পাবে। সে যে কোন ধরনের মানসিক ব্যধি থেকেও মুক্ত থাকবে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, **মন্মনা ভব মৎ ভক্ত মদ্ যাজি, মাং নমস্কুরু**—অর্থাৎ মন আমাতে নিবিষ্ট কর, আমার ভক্ত হও, আমাকে নমস্কার—অর্থাৎ আমার শরনাগত হও। তাহলেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান মিলবে। তাই পরমেশ্বর ভগবানই একমাত্র জীবের মানসিক শান্তি দিতে পারেন।

প্রশ্ন : ৩৮৭ ॥ মলমাস কি? বৈষ্ণবরা একে পুরুষোত্তম মাস বলেন। এর কারণ কি?

উত্তর : চান্দ্র মাস এবং সৌরমাসের মধ্যে মিল রাখার জন্য ৩২ মাসে একটি করে মাস দিতে হয়। একেই স্মৃতি শাস্ত্রের পণ্ডিতরা মলমাস বলেন। যে মাসে দুইটি অমাবস্যা তিথির আগমন হয় তাকেই মলবাস বলা হয়। বৈষ্ণবরা একে অধিমাস বলেন।

নারদীয় পুরানের ৩১ম অধ্যায়ে বলা হয়েছে অধিমাস নিজের অপমান এবং দ্বাদশ মাসের আধিপত্য বিবেচনা করে বৈকুণ্ঠের অধিপতি নারায়ণের কাছে নিজের দুঃখ জানায়। নারায়ণ অধিমাসকে নিয়ে গোলোকপতি শ্রী কৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হন। অধিমাসের আর্তি জেনে কৃপালু ভগবান ঘোষণা করেন যে জগতে আমি পুরুষোত্তম রূপে পরিচিত এবং বিখ্যাত। তাই অধিমাসও জগতে পুরুষোত্তম মাস বলে খ্যাত হবে। এরূপে অধিমাসই সব মাসের অধিপতি হয়।

অন্যসব মাস সকাম। কিন্তু অধিমাস নিষ্কাম। তাই যে এই মাসের পুজা করবে সে সমস্ত কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে।

প্রশ্ন : ৩৮৮ ॥ মন অত্যন্ত চঞ্চল। একে সংযত করার উপায় কি?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় (৬/৩৪) অর্জুন ভগবানকে বলেছেন যে, মন অত্যন্ত চঞ্চল, প্রবল এবং শরীর এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বিক্ষেপ উৎপাদন করে। তাকে বিষয়-বাসনা থেকে বিরত রাখা খুবই কঠিন। তাই এই মনকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার চেয়েও কঠিন বলে আমি মনে করি।

এই চঞ্চল মনকে সংযত করার উপায় কি? তার উত্তরও গীতায় (৬/৩৫) ভগবান দিয়েছেন। মন যে দুর্বার ও চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। বৈরাগ্য মানে সব কিছু ত্যাগ করা বুঝায় না। বৈরাগ্য বলতে অনাসক্তি বুঝায়। অর্থাৎ জড়জগতে কোনকিছুকেই নিজের বলে মনে না করে সবকিছুকেই ভগবানের বলে মনে করা দরকার। এইভাবে নিজের চিন্তাকে ভগবৎমুখী করে আমরা যদি জীবনযাপন করি তাহলে মন সংযত হয়ে আসবে এবং আমাদের জীবন সার্থক হবে।

প্রশ্ন : ৩৮৯ ॥ মায়াপুরে ইসকন মন্দিরে অষ্টসখীসহ রাধাকৃষ্ণের যে অপূর্ব বিগ্রহ আছে সেগুলো কোন্ সময়ে স্থাপিত হয়?

উত্তর : ভারতের কলকাতার এক বিত্তশালী শিল্পপতি এবং ইসকন ভক্ত শ্রীরাধাপদ দাসের অর্থানুকূল্যে প্রথমে ১৯৮০ সালে শ্রীগৌর পূর্ণিমা উৎসবের সময় শ্রী শ্রী রাধা-মাধবের বিগ্রহ স্থাপিত হয়। পরে একই ভক্তের অর্থসাহায্যে ১৯৮৬ সালে চারজন এবং ১৯৯২ সালে বাকী চারজন গোপীর শ্রীমূর্তি স্থাপন করা হয়। এই শ্রী বিগ্রহসমূহ ভারতের জয়পুরের নাম করা ভাস্কর পরিবার পাণ্ডেরা খোদাই করে দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ৩৯০ ॥ মনুষ্য জ্ঞানকে অপূর্ণ বলা হয় কেন? বৈদিক জ্ঞান কেন অভ্রান্ত?

উত্তর : মনুষ্যজ্ঞান সীমিত। আবার এই সীমিত জ্ঞানও ৪ রকমের ক্রটী দ্বারা বিকৃত।

১. ভ্রম—সাধারণ মানুষ নিশ্চিতভাবেই ভুল করে।
২. প্রমাদ—সে মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন।
৩. বিপ্রলিপ্সা—সে অন্যকে প্রতারণা করতে চেষ্টা করে।
৪. করণাপাটব—সে তার ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমিত।

উপরোক্ত চার ধরনের ত্রুটি থাকায় যে পরমজ্ঞান চারদিকে পরিব্যাপ্ত আছে মানুষ তা গ্রহণ করতে এবং প্রদান করতে অক্ষম হয়।

বৈদিক জ্ঞান জড়-জাগতিক জ্ঞান নয়। এর মূলে রয়েছে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। তাই বেদের জ্ঞান হল দিব্য জ্ঞান। ভগবানের মুখঃনিসৃত বাণী হল অপৌরুষেয়। অর্থাৎ ভগবানের কথা সাধারণ মানুষের কথার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভগবানের কোন ত্রুটি নেই, তাঁর জ্ঞান অসীম। এসব কারণে বৈদিক জ্ঞানকে পূর্ণ বা অভ্রান্ত বলা হয়।

প্রশ্ন : ৩৯১ ॥ মায়াপুরে যে শ্রী নৃসিংহদেব আছেন এটি তাঁর কোনরূপ?

উত্তর : শ্রীধাম মায়াপুরে ইসকন মন্দিরে শ্রীনৃসিংহদেবের স্থাপিত মূর্ত্তি হলেন স্থানু নৃসিংহ। এক উগ্রশ্রেণীর বিশেষভাবের বিগ্রহকে বলা হয় স্থানু-নৃসিংহ। এই স্থানু-নৃসিংহ শ্রেণীতে নয় ধরনের উগ্ররূপ আছে। এঁরা সকলেই খুব ভয়ঙ্কর। ইস্‌কন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত স্থানু শ্রী নৃসিংহদেব স্তম্ভ বিদীর্ন করে বাইরে আসছেন। পৃথিবীর আর কোথায়ও এই স্থানু নৃসিংহ প্রকাশিত হন নাই। এমনকি স্বর্গের দেবতারা ভয়ে এই রূপের আরাধনা করেন না।

প্রশ্ন : ৩৯২ ॥ মহাপ্রলয়ের পর জীবাত্মাসমূহ কোথায় যাবে বা অবস্থান করবে?

উত্তর : মহাবিষ্ণু থেকেই জীবাত্মার সৃষ্টি। শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে মহাপ্রলয়ের পর আবার এইসব আত্মা মহাবিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করবে। কাঠের মধ্যে আগুন যেমন সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তেমনিভাবে জীবের আত্মাসমূহ মহাবিষ্ণুর শরীরে সুপ্তভাবে অবস্থান করবে।

প্রশ্ন : ৩৯৩ ॥ মানুষের প্রকৃত খাদ্য কি?

উত্তর : শাস্ত্রে খাদ্যকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে : সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। শেষোক্ত দুই ধরনের খাবার মানুষকে ভগবদ্ বিমুখ করে। ভক্তিপথ অবলম্বন, শুদ্ধভাবে জীবন পরিচালনা এবং পারমার্থিক বা কৃষ্ণ ভাবনা বিকাশের জন্য মানুষকে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হতে হবে। এছাড়া গীতায় (৯/২৭) ভগবানকে নিবেদন করে খাদ্য গ্রহণের কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। আর ভগবানকে কেবলমাত্র সত্ত্বগুণসম্পন্ন খাদ্য দ্রব্যাদি নিবেদন করা সম্ভব। তাই মানুষের প্রকৃত খাদ্য সত্ত্বগুণসম্পন্ন হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : ৩৯৪ ॥ মহাভারতে উল্লিখিত ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়ের পিতার নাম কি ছিল?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (১/১৩/৩২) সঞ্জয়কে গাবল্গন বলা হয়েছে। অর্থাৎ সুত গবল্গন সঞ্জয়ের পিতা ছিলেন। সুত বলতে রথের চালক বুঝায়।

প্রশ্ন : ৩৯৫ ॥ মহাপ্রভু স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান হয়েও কেন পুরীধামে জগন্নাথদেবকে প্রণাম নিবেদন করতেন?

উত্তর : গীতায় ভগবান বলেছিলেন মন্মনা ভব, মদ্ভক্ত, মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু—আমারভাবে ভাবিত হও, আমার ভক্ত হও এবং আমাকে নমস্কার কর। কিন্তু কলিকালে আমরা তা করতে অক্ষম হওয়ায় ভগবান নিজেই ভক্তের রূপ ধরে শ্রীমন্ মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হন। ভক্তিযোগের বিভিন্ন দিক জীবকে শিখানোর জন্যই তিনি বিভিন্ন লীলা প্রদর্শন করেছেন। শ্রীজগন্নাথ দেব তাঁরই একরূপ। শ্রীজগন্নাথ দেবের কাছেও আত্মসমর্পণ করলে যে জীবের মুক্তি হতে পারে তা প্রদর্শনের জন্যই তিনি জগন্নাথ মন্দিরে প্রতিদিন গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেন। এই প্রণাম আমাদেরকে শিক্ষা দেবার জন্য মাত্র। তাছাড়া তিনি নিজকেই নিজে প্রণাম করেছেন, অন্যকে নয়।

প্রশ্ন : ৩৯৬ ॥ মহাপ্রভুর কতটি নাম আছে এবং সেগুলো কি কি?

উত্তর : শ্রীমন মহাপ্রভু ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। ভগবানের নাম অসংখ্য হয়। তারপরও এই জড়জগতে তিনি যখন নরদেহে আবির্ভূত হন তখন আমরা তাকে সসীম সংখ্যক নামেই অভিহিত করি। প্রচলিত অর্থে তাঁর এগারটা নাম আছে। এই নামগুলো হল : (ক) নিমাই, (খ) বিশ্বম্ভর, (গ) গৌরচন্দ্র, (ঘ) মায়াপুরচন্দ্র, (ঙ) শচীনন্দন, (চ) গৌরহরি, (ছ) নদীয়াবিহারী, (জ) রাধাভাব, (ঝ) ভক্তরূপ, (ঞ) শ্রী গৌরাঙ্গ ও (ট) শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু।

প্রশ্ন : ৩৯৭ ॥ মনুসংহিতায় শুদ্রগণের বেদ অধ্যয়নের অধিকার নেই বলা হয়েছে। এই কথা কি গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : বৈদিক যুগে যজ্ঞাদি এবং মন্ত্রের সফলতার ভিত্তি ছিল এগুলোর সঠিক অনুষ্ঠান এবং আবৃত্তিতে। নির্ভুল অনুশীলন বহুদিনের অভ্যাস সাপেক্ষ ছিল বলে যারা সমাজের পরিচর্যা কাজে রত তারা হঠাৎ চেষ্টা করলে বিভ্রাট ঘটতে পারে মনে করে শূদ্রের জন্য বৈদিক কর্মকাণ্ডে অনধিকার আরোপিত হয়েছিল বলে মনে হয়। যে মনু শূদ্রের বেদপাঠ নিষিদ্ধ করেছিলেন তিনিই আবার বলেছেন যে মন্ত্র বর্জন পূর্বক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করলে শূদ্র নিন্দনীয় নয়, বরং প্রশংসনীয় হবে (মনু সংহিতা ১০/১২৭)।

বেদচর্চার জন্য বহুদিনের অভ্যাস এবং চারিত্রিক শুদ্ধতার প্রয়োজন। যজুর্বেদে বলা হয়েছে শূদ্রাদি সমেত সমগ্র মানবজাতির জন্যই বেদবাণী উদ্দিষ্ট হয়েছিল (যজুঃবেদ ২৬/২)। মহাভারতে (শান্তি পর্ব ১৮৮/১৩) বলা হয়েছে শূদ্র বলা হত সেই ব্যক্তিকে যিনি বেদ পরিত্যাগ করে অজ্ঞানত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, লোভের বশবর্তী হয়ে যে কোন কিছু ভোজন করেন এবং হিংসা ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ব্যাধের ন্যায় জীবনযাপন করেন। এই রূপে সদাচার ভ্রষ্ট এবং স্বেচ্ছাচারী বলে শূদ্রের অন্তর-বাহির অপবিত্র এবং সেজন্যই নিজের কর্মবশতঃ তিনি বেদ অধ্যয়নের অনধিকারী হলেন (মহাভারত শান্তিপর্ব ১৮৮/১৫৩)। বৃত্তিমূলক বর্ণবিভাগ হওয়ার পরও সকলেরই বৈদিক যজ্ঞক্রিয়ার

অধিকার ছিল, কিন্তু কালক্রমে লোভী ব্রাহ্মণগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়ে বেদ অধ্যয়নে অনিধিকারী হলেন (মহাভারত শান্তিপর্ব ১৮৮/১০-১৫)।

সনাতন ধর্মানুযায়ী নিজের কর্ম অনুযায়ীই মানুষের বর্ণ হয়। জন্মগত জাতিভেদের কোন স্থান এই ধর্মে নেই। কেউ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েও বেদ অধ্যয়ন ত্যাগ করে কোন হীনবৃত্তি এবং ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হলে তাকে শূদ্র বলা হতো। অপরদিকে কোন শূদ্রের মধ্যে যদি সত্য, দান, দয়া, তপস্যা ইত্যাদি ব্রাহ্মনোচিত গুণ দেখা যেত তবে তিনি ব্রাহ্মণই আখ্যা পেতেন। (মনু সংহিতা ১১/১০২)। ধীবর কন্যা সত্যবতীর সন্তান শ্রীল ব্যাসদেব, দাসীপুত্র দেবর্ষি নারদ প্রমুখ কি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন নাই?

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যবন হরিদাসের বেদ পাঠকে শুধু অনুমোদন নয়, পাশাপাশি প্রশংসা করেছেন। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা থেকে দেখা যায়—

হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুই নিচ অস্পৃশ্য পরম পামরে ॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
... ...
নিরন্তর চারিবেদ কর অধ্যয়ন ॥

এরপরও কি আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে?

প্রশ্ন : ৩৯৮ ॥ মহাভারত কাব্যের নামকরণ কিভাবে হয়? এতে কি কি বিষয় আছে?

উত্তর : মহাভারত গ্রন্থের নামকরণ এই কাব্যেই স্বয়ং শ্রীল ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন। পুরাকালে দেবগণ মিলিত হয়ে তুলাদণ্ডের একদিকে সরহস্য বেদ ও অপর দিকে মহাভারত স্থাপন করে ওজন করেছিলেন। এই গ্রন্থের মহত্ব ও গুরুত্ব (ভার বত্ব) বেশি হওয়ায় এটি মহাভারত নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে (মহাভারত আদিপর্ব ১/২৭২-২৭৩)। আবার ভরত বংশের রাজাদের জন্মবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য একে **ভারত**-ও বলা হয়। এই মহাভারতকে কার্ষ্ণ বেদ—অর্থাৎ

মহর্ষি শ্রী কৃষ্ণ (দ্বৈ পায়ন) কর্তৃক বিরচিত বেদ এবং একে পঞ্চম বেদও বলা হয়। (আদি ৬৩/৮৯, শান্তিপর্ব ৩৪০/২১)।

মহাভারত একাধারে ধর্ম শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, মোক্ষ শাস্ত্র, পুরান, ইতিহাস এবং কাব্য। প্রবাদ আছে যা নাই মহাভারতে তা নেই ভারতে। (আদি ২/২৮৩, ২/৩৯০)। এই অনুপম গ্রন্থে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণ পরিচয় মিলে।

প্রশ্ন : ৩৯৯ ॥ মহাভারতের মূল বক্তব্য বা সুর কি?

উত্তর : মহাভারতে বহুকিছু থাকলেও এর মূল বক্তব্য বা সুর হলো—

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ

অর্থাৎ ধর্ম যেখানে জয় সেখানে। অধর্মের পথে মানুষ আপাততঃ জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মেরই জয় হয়। মহাভারতে নানাভাবে এই মহাসত্যকেই তুলে ধরা হয়েছে (মহাভারত উদ্যোগ পর্ব ৩৯/৯, ১৪৮/১৬, ভীষ্ম পর্ব ২১/১১, শল্যপর্ব ৬৩/৬০, স্ত্রীপর্ব ১৪/৯, ১২)।

প্রশ্ন : ৪০০ ॥ মহাভারতে কুরু এবং পাণ্ডবদেরকে কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে?

উত্তর : মহাভারতে শ্রীল ব্যাসদের কুরুদেরকে অধার্মিক এবং পান্ডবদেরকে ধার্মিক বলে বর্ণনা করেছেন। মহাভারতের আদিতেই তিনি বলেছেন : "দুর্যোধন অহঙ্কারী মহাবৃক্ষ, কর্ণ সেই বৃক্ষের স্কন্দ, শকুনি তাহার শাখা, দুঃশাসন সেই বৃক্ষের সমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল, আর বৃক্ষটির মূল হইতেছেন—প্রজ্ঞাহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্র"। (আদি ১/১১১)।

আবার পাণ্ডবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : "যুধিষ্ঠির ধর্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জুন এই বৃক্ষের স্কন্দ, ভীমসেন ইহার শাখা, মাদ্রীসুত নকুল এবং সহদেব এই বৃক্ষের সমৃদ্ধ পুষ্প ও ফল, ইহার মূল শ্রীকৃষ্ণ, বেদ ও ব্রাহ্মণগণ।" (আদি ১/১১১)।

প্রশ্ন : ৪০১ ॥ মহাভারতের উপসংহারে চারটি শ্লোক আছে সেগুলো কি নামে পরিচিত? এগুলোর তাৎপর্য কি?

উত্তর : মহাভারতের উপসংহারে শ্রীল ব্যাসদেব যে চারটি শ্লোক লিখেছেন সেগুলো **ভারত সাবিত্রী** নামে অভিহিত। মহর্ষি ব্যাসদেব

মহাভারত রচনা করে নিজপুত্র শ্রীল শুকদেবকে প্রথমত এই চারটি শ্লোকের মাধ্যমেই সমগ্র মহাভারতের তাৎপর্য অধ্যায়ন করিয়েছিলেন।

স্বর্গারোহন পর্ব্বের (৫/৬১-৬৪) অন্তর্গত এই চারটি শ্লোকের বক্তব্য হল : "জন্ম-জন্মান্তরে সহস্র সহস্র মাতা-পিতা এবং শত শত স্ত্রী-পুত্রের সহিত সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। তাঁহারা সকলেই গিয়াছেন, অন্যেরাও যাইবেন। জীবনে অসংখ্য আনন্দের এবং অসংখ্য ভয়ের বিষয় উপস্থিত হয়। মূঢ় ব্যক্তিগণকেই আনন্দ, ভয় প্রভৃতি অভিভূত করিয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না। ধর্মপথে থাকিলেই অর্থ এবং কাম উপভোগ করিতে পারা যায়। কেন লোকে ধর্মের সেবা করে না—এই কথা আমি উর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চস্বরে বলিতেছি; কিন্তু মোহই আমার কথা শুনিতেছে না।

কামনা, ভয় বা লোভবশত: এমনকি জীবনরক্ষার নিমিত্তও কদাচিৎ ধর্মকে ত্যাগ করিবে না। ধর্ম নিত্য, পরন্তু সুখ-দুঃখ অনিত্য। জীব নিত্য, পরন্তু শরীরের সহিত জীবের সম্বন্ধ অনিত্য।"

প্রশ্ন : ৪০২ ॥ মহাভারতের বেশ কিছু শ্লোক অতিগুঢ় অর্থবোধক। এগুলোকে কি বলা হয়?

উত্তর : মহাভারতে আট হাজার আটশত শ্লোক অতিগুঢ়ার্থ প্রকাশক—অর্থাৎ এগুলো অতি তাৎপর্যময় অর্থ প্রকাশ করে। এগুলোকে ব্যাসকূট বলা হয়।

প্রশ্ন : ৪০৩ ॥ মাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়কে কেন ব্রহ্ম সম্প্রদায়ও বলা হয়?

উত্তর : এর মূল কারণ হলো এই সম্প্রদায়ের সূচনার আদিতে রয়েছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা ভগবদ্ তত্ত্ব জ্ঞান দান করেন নারদকে। নারদ ব্যাসদেবকে এবং ব্যাসদেব মধ্বমুনি বা মধ্বাচার্যকে তা দান করেন। মাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবর্তক মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ছিলেন মধ্বাচার্য-সম্প্রদায় ভুক্ত।

প্রশ্ন : ৪০৪ ॥ ভগবানকে অবাঙ্মানসগোচর বলা হয় কেন?

উত্তর : অবাঙ্মানসগোচর শব্দ দ্বারা বাক্য ও মনের অতীত বুঝায়। মানুষ নিজের সীমিত বুদ্ধি এবং বোধশক্তি অনুসারে কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে মাত্র। ভগবান আমাদের সীমিত জ্ঞান এবং বিদ্যা-বুদ্ধির অতীত। ভগবদ্ গীতায় (১০/২) শ্রী ভগবান বলেছেন, এমনকি মহান ঋষি এবং দেবতাগণও তাকে জানতে পারেন না। এই জন্যই উপনিষদে এই বলে আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান হলেন অবাঙ্মানসগোচর।

প্রশ্ন : ৪০৫ ॥ ভগবানের হয়গ্রীব অবতার কি?

উত্তর : হয় শব্দ দ্বারা ঘোড়া বুঝায়। গ্রীব শব্দের অর্থ গলা। তাই হয়গ্রীব অবতার বলতে ঘোড়ার মত গলা বিশিষ্ট ভগবানের অবতার বুঝায়। একসময় ব্রহ্মার যজ্ঞ কুণ্ড থেকে শ্রী ভগবান হয়গ্রীব (অর্থাৎ অর্ধেক নর এবং অর্ধেক অশ্ব বা ঘোড়া) রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল স্বর্ণের ন্যায়। তাঁর শরীর থেকে ঐ সময় চারিবেদ আবির্ভূত হয়। একসময় মধু ও কৌটভ নামে দৈত্য বেদ অপহরণ করে নিয়ে রসাতলে চলে যায়। হয়গ্রীব রূপী ভগবান তাদেরকে নিহত করে বেদসমূহ উদ্ধার করেন। পরে ব্রহ্মা প্রার্থনা করলে ভগবান তাঁকে বেদ দান করেন।

প্রশ্ন : ৪০৬ ॥ ভগবানের কি কি শক্তি রয়েছে?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি অসংখ্য। তবে তাঁর সব শক্তিকে বিস্তৃত অর্থে তিনভাগে ভাগ করা যায় : অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি এবং তটস্থা শক্তি। এই তিন শক্তির প্রতিটির আবার শত শত লক্ষ লক্ষ উপবিভাগ আছে। যেমন বায়ু, আলোক, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনাবলির নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্পন্ন দেবতারা ভগবানের তটস্থা শক্তিজাত। মানুষসহ সমস্ত জীবাত্মাও ভগবানের তটস্থা শক্তির অন্তর্গত। এই জড়জগৎ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির ফল। আর চিদাকাশ যেখানে ভগবৎ ধাম অবস্থিত, তা শ্রী ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ।

প্রশ্ন : ৪০৭ ॥ ভক্তিলতা বৃদ্ধির পথে কি কি আগাছা (বাধা) রয়েছে?

উত্তর : বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী ভক্তিলতা বৃদ্ধির পথে নিম্নোক্ত বাধা বা আগাছা রয়েছে—

১. ভুক্তি—অর্থাৎ জড়জাগতিক ভোগ-বাসনা।
২. মুক্তিবাঞ্ছা—অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি লাভের ইচ্ছা।
৩. নিষিদ্ধ আচার—নেশা, আমিষ আহার, জুয়া, অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ।
৪. কুটীনাটি—অন্যের দোষ ধরার অভ্যাস, কূটনীতি, কুতর্ক, শঠতা।
৫. জীবহিংসা—অন্যের প্রতি বিদ্বেষ, জীব হত্যা।
৬. লাভেচ্ছা—জড় বিষয়ে লোভ-লালসা।
৭. পুজা—অন্যের কাছ থেকে সম্মান লাভের ইচ্ছা, প্রশংসা এবং বাহাহবা পাওয়ার মনোভাব।
৮. প্রতিষ্ঠাশা—উচ্চ পদ, যশ, খ্যাতি অর্জনের আকাঙ্খা।

উপরোক্ত আগাছা বা বাধাগুলি হৃদয়ে থাকলে শুদ্ধভাবে নাম জপ হয় না।

প্রশ্ন : ৪০৮ ॥ ভগবানের দেহ এবং জীবদেহের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর : শ্রী ঈশোপনিষদ এবং শ্রী ব্রহ্মসংহিতা সহ অনেক ভগবদ্ শাস্ত্রেই পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত নিত্যরূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐসব বর্ণনা থেকেই জানতে পারা যায় শ্রী ভগবানের জড়াতীত অপ্রাকৃত দেহ আছে।

জীবদেহ জড়াকৃতির সৃষ্টি এবং তারা যন্ত্রের মতই কাজ করে। কারণ শিরা-ধমনী ইত্যাদি সমেত জীবদেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন গঠন যন্ত্রের মতই। কিন্তু ভগবানের দেহ অপ্রাকৃত। এই চিন্ময় দেহে ধমনী-শিরাদি বলতে কিছু নেই। **শ্রী ঈশোপনিষদের** ৮নং মন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ভগবান অরূপ বিগ্রহ—অর্থাৎ তাঁর দেহ এবং আত্মায় কোন ভেদ নেই। আমাদের মতো কোন প্রাকৃত গুণময়ী দেহ

তিনি ধারণ করেন না। পার্থিব জীবন ধারণা অনুসারে সুক্ষমন এবং জড় দেহ থেকে আত্মা ভিন্ন। কিন্তু শ্রীভগবানের চিন্ময় শরীরে এরূপ কোন ভেদ নেই। তিনি পূর্ণ। তাঁর দেহ, মন এবং স্বয়ং তিনি এক ও অভিন্ন।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় আরোও বলা হয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর চিন্ময় শরীরের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কোন কাজ করতে পারেন। যেমন ভগবান ইচ্ছা করলে হাত দিয়ে হাটতে পারেন, পা দ্বারা দর্শন করতে পারেন এবং চোখ দিয়ে নিবেদিত খাদ্য গ্রহণ করতে পারেন। কোন জড়জীব কি তা পারে? শ্রুতি শাস্ত্রে আছে ভগবানের হাত এবং পা আমাদের মতো নয়—অন্য রকম। ভগবানের দেহ আমাদের মতো অক্ষজ নয়, অধোক্ষজ—জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাঁকে দেখা এবং অনুভব করা যায় না।

প্রশ্ন : ৪০৯ ॥ ভগবান স্বয়ং সম্পূর্ণ—এই কথা দ্বারা কি বুঝানো হয়?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবানই কেবলমাত্র স্বয়ং সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ যখন দ্বাপরে আবির্ভূত হন তখন তিনি তাঁর দিব্যলীলার মাধ্যমে ভগবৎবতার সম্পূর্ণ প্রকট করেছিলেন। বাল্যলীলায় তিনি বহু অসুর এবং দানব সংহার করেন। এই সব লীলা দেখানোর জন্য তাঁকে কোন অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্জন করতে হয় নাই। তিনি সাধারণ জীবের মতো ভারোওলন অনুশীলন না করেই বিশাল গিরি গোবর্ধন উত্তোলন করেন।

শ্রী ঈশোপনিষদে ভগবান শ্রী কৃষ্ণকে শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ বলা হয়েছে। তিনি এই অর্থে শুদ্ধ যে জড়জগতের বিচারে যা অশুদ্ধ, অশুচি তাঁর স্পর্শমাত্র সবকিছু পবিত্র হয়ে যায়। এক্ষেত্রে অপাপবিদ্ধ কথাটি ভগবানের সান্নিধ্য শক্তি বুঝায়। শ্রীভগবান অপাপবিদ্ধ—অর্থাৎ কোন পাপই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কোন কাজ পাপ মনে হতে পারে। কিন্তু তিনি কখনো পাপ দ্বারা প্রভাবিত হন না বলে তাঁর সব কাজই পবিত্র। সব অবস্থাতেই তিনি সূর্যের মতো পবিত্রতম। এইজন্য শ্রুতি শাস্ত্রে শ্রীভগবানকে **শুক্রম**—অর্থাৎ

সর্বশক্তিমান বলে অভিহিত করা হয়েছে। কারণ তিনি তাঁর ইচ্ছামত সচল এবং অচল থাকতে পারেন; যে কোন চিন্ময় ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোন কাজ করতে পারেন।

প্রশ্ন : ৪১০ ॥ ভগবানের অনন্তগুণের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ গুণ কি?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুর ঈশ্বর। তিনি সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু ভগবান সবকিছুর ঈশ্বর, সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করেন—এটি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ নয়। ভগবানের শ্রেষ্ঠগুণ হল তাঁর করুণা, ভক্তকে কৃপা বা অনুগ্রহ করা। ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য ভগবান সবসময় উদ্বিগ্ন থাকেন। সেজন্যই তিনি ভগবান। আসলে ভগবান তাঁর ভক্তের নিয়ন্ত্রনাধীন হন বলে ভগবান হয়েছেন। ভগবানের শ্রেষ্ঠতা নিয়ন্ত্রণকর্তা বলে নয়। **অহং ভক্ত পরাধীনো-জনপ্রিয়ঃ**—এই হল তাঁর শ্রেষ্ঠতা।

প্রশ্ন : ৪১১ ॥ ভারতবর্ষের বাইরে সর্বপ্রথম রথযাত্রা কোথায় এবং কার নেতৃত্বে আরম্ভ হয়েছিল?

উত্তর : ভারতের বাইরে পাশ্চাত্যের আমেরিকার সান-ফ্রান্সিসকো শহরে সর্বপ্রথম জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা শুরু হয় ১৯৬৭ সালে। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয় চরণারবৃন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর কতিপয় শিষ্যগণের সহযোগিতায় সেই রথযাত্রা উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৪১২ ॥ ভগবদ্ গীতার বিভিন্ন ভাষ্য আছে। কোন্‌টি আমাদের জন্য উপযুক্ত এবং কেন?

উত্তর : বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় ভগবদ্ গীতার বিভিন্ন ভাষ্য আছে। বেশিরভাগ ভাষ্যকারই ভগবদ্ গীতার মূলভাব বজায় না রেখে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। ভগবদ্ গীতা যথাযথভাবে অনুবাদ করতে গেলে অনুবাদককে অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের ভক্ত হতে হবে। তাছাড়া এই অনুবাদ প্রামানিক শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরার অনুসারী হতে হবে। শেষোক্ত উপায়ে গীতার অনুবাদ এবং ভাষ্য হলে কেবলমাত্র সেটি উপযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য বলা যায়।

প্রশ্ন : ৪১৩ ॥ ভগবদ্ গীতা কি?

উত্তর : গীতা শব্দের সাধারণ অর্থ হল যা বলা বা গাওয়া হয়েছে। ভগবৎ বলতে পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কিত সবকিছু বুঝায়। তাই যে বৈদিক শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবান নিজেই সবকিছু ব্যক্ত করেছেন বা বলেছেন তাই হল ভগবদ্ গীতা।

ভগবদ্ গীতার আরেক নাম গীতোপনিষদ। কারণ সমস্ত উপনিষদের সারবস্তু এতে নিহিত রয়েছে। এটি বৈদিক দর্শনের সারমর্ম এবং বৈদিক সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ উপনিষদ। আজকের নতুন দিল্লী নগরী থেকে ১৩০ মাইল উত্তরে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান শ্রী কৃষ্ণ অর্জুনের কাছে এই জ্ঞান প্রকাশ করেছিলেন। মহর্ষি ব্যাসদেব সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণ এবং অর্জুনের কথপোকথন নথিভুক্ত করে তাঁর মহাকাব্য মহাভারতে অন্তর্ভুক্ত করেন।

প্রশ্ন : ৪১৪ ॥ ভগবদ্ গীতার জ্ঞান প্রদানের জন্য অর্জুনকেই শ্রী কৃষ্ণ কেন বেছে নিয়েছিলেন?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান তাঁর জ্ঞান যাকে তাকে যেন তেন প্রকারে বিতরণ করেন না এটিই প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে। কেবলমাত্র কোন পরম ভক্তের সাথেই ভগবানের সক্রিয় যোগাযোগ হয় এবং থাকে। অর্জুন ছিলেন শ্রী কৃষ্ণের পরম ভক্ত এবং সখা। এই জন্যই দেখা যায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে তুমি আমার ভক্ত এবং সখা। তাই এই পরম গোপনীয় জ্ঞান আমি তোমাকেই দান করছি। ভগবান অর্জুনকে স্পষ্টভাবে বলেন যে আগের পরম্পরা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি তাঁকে দিয়ে আবার সেই পুরাতন যোগের প্রচার করলেন। এথেকে বুঝা যায় ভগবৎ জ্ঞান কেবলমাত্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্তই গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন : ৪১৫ ॥ ভগবদ্ গীতায় ভগবান উবাচ কথাটি অনেকবারই রয়েছে। এই ভগবান এবং গীতার বক্তা শ্রী কৃষ্ণ কি ভিন্ন না অভিন্ন? কিছু লোক বলেন এই ভগবান এবং শ্রী কৃষ্ণ ভিন্ন ব্যক্তি। আসলে কি তাই?

উত্তর : যারা শ্রী কৃষ্ণ বিদ্বেষী, শাক্ত রীতিনীতিতে বিশ্বাসী তারাই এরূপ কথা বলেন। ভগবান কথাটি অবশ্য কখনো কখনো দেবদেবীর

ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার বক্তা হলেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ। যদি [illegible] হতো তবে কিভাবে শ্রী কৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখাতে পারলেন? সমস্ত সত্যদ্রষ্টা এবং ভগবদ তত্ত্ববিদ—যেমন শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বাকাচার্য, প্রমুখ গীতার ভগবান বলতে পরমেশ্বর শ্রী কৃষ্ণকেই বুঝিয়েছেন। ব্রহ্ম সংহিতা, শ্রীমদ্ ভাগবত সহ সব পুরানশাস্ত্রে শ্রী কৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলা হয়েছে। ব্রহ্ম সংহিতায় **ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ**-এর কথা আছে। এরপরও কেউ গীতার ভগবান উবাচ এর প্রসঙ্গ টেনে কৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান না মানলে সে যে বিকৃতি মস্তিষ্ক সম্পন্ন তা বলাই বাহুল্য।

প্রশ্ন : ৪১৬ ॥ ভগবানের সাথে কোন জীব কিভাবে যুক্ত হতে পারে?

উত্তর : জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। এই কথা ভুলে গেলেই সে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিত্যবদ্ধ জীবে পরিণত হয়। কেউ ভক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সাথে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন হয়। এই বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিস্তৃত বিষয়। তবে সংক্ষেপে বলা হয়, ভক্ত ভগবানের সাথে নিম্নোক্ত পাঁচ ধরনের সম্পর্কের যে কোন একটি দ্বারা যুক্ত হতে পারেন—

১. পরোক্ষভাবে ভক্ত হতে পারেন (শান্ত ভাব)।
২. সরাসরি ভক্ত হতে পারেন (দাস্য ভাব)।
৩. বন্ধুরূপে ভক্ত হতে পারেন (সখ্য ভাব)।
৪. অভিভাবক রূপে ভক্ত হতে পারেন (বাৎসল্য ভাব)।
৫. প্রেমিকারূপে ভক্ত হতে পারেন (মাধুর্য ভাব)।

প্রশ্ন : ৪১৭ ॥ ভগবানের এক নাম গোবিন্দ। এই গোবিন্দ শব্দটি দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তর : গো + ইন্দ্র = গোবিন্দ—সন্ধিবিচ্ছেদ করলে এইভাবে গোবিন্দ শব্দটি পাওয়া যায়। গো হল গাভী সকল, ইন্দ্র শব্দের এক অর্থ ইন্দ্রিয়সমূহ। তাই যিনি গাভী এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করেন অথবা এগুলোকে আনন্দ দান করেন গোবিন্দ শব্দের মাধ্যমে তাঁকেই উল্লেখ

করা হয়। ভগবানের অনেক অবতার আছেন। কিন্তু গোবিন্দ (কৃষ্ণ) হলেন আদি পুরুষ। তিনি ভগবানের কোন অবতারের প্রকাশ নন। তিনিই স্বয়ং ভগবান, সব অবতারের উৎস। তিনি কোন নির্ব্বিশেষ জ্যোতি অথবা নিরাকার নন, বরং সবদিক থেকেই তিনি সম্পূর্ণ এক ব্যক্তি। ব্রহ্মসংহিতার **গোবিন্দম্ আদি পুরুষং তমহং ভজামি**—শ্রী ব্রহ্মার এই উক্তি থেকেই সব কিছু বুঝা যায়।

প্রশ্ন : ৪১৮ ॥ ভগবান জীবের কোথায় অবস্থান করেন এবং সেখানে থেকে তিনি কি করেন?

উত্তর : ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন। সেখানে থেকে তিনি জীবের কার্যকলাপের সাক্ষী থাকেন। গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন সর্বভুতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

অর্থাৎ ভগবান সকলের হৃদয়ে অবস্থান করে সকল জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহন করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমন করান। যারা অভক্ত তারা বুঝতে পারে না যে ভগবান কিভাবে হৃদয়ে অবস্থান করে নির্দেশ করেন। কিন্তু যারা ভক্ত তারা সেটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ভক্তগণ তাই হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে ভগবানের নির্দেশ শ্রবণ করার বা অনুভব করার চেষ্টা করেন। তবে সঠিকভাবে বা যথাযথভাবে তা শ্রবণের জন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন। তাঁকে অবশ্যই পারমার্থিক উন্নতির নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করতে হবে। ভগবদ গীতায় (১০/১০) কৃষ্ণ বলেছেন যারা তাঁর শরনাগত তিনি তাদেরকে যথার্থ উপায় এবং বুদ্ধি প্রদান করেন যাতে তারা তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপর্যান্তি তে ॥

অর্থাৎ যারা নিত্য ভক্তিযোগে প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করে, তাদেরকে আমি শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধি যোগ দান করি যাতে তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।

প্রশ্ন : ৪১৯ ॥ ভগবানের ইচ্ছায় নাকি সবকিছুই হয়। তাহলে কেউ চুরি করলে তার পাপ হবে কেন?

উত্তর : ভগবান জীবকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। জীব তাঁকে ভুলে গেলেই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জড়জাগতিক কামনা বাসনার জন্য বিভিন্ন ধরনের পাপকর্মে লিপ্ত হয়। ভগবদ্‌গীতায় (১৫/১৫) বলা হয়েছে, আমাদের আকাঙ্খা অনুসারে ভগবান আমাদেরকে তাঁর স্মরণ এবং বিস্মরণ উভয়ই প্রদান করেন। ভগবান বলেছেন, "আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি এবং আমার থেকেই সমস্ত জীবের স্মৃতি এবং জ্ঞান উৎপন্ন এবং বিলোপ হয়।" যারা ভগবানের কাছে শরনাগত হয় না—অর্থাৎ নিজেকে স্বতন্ত্র ধরে কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাদেরই ভগবান ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ প্রদান করেন। "ও, তুমি এটি করতে চাও? তাহলে এই নাও সেই সুযোগ। তুমি যদি চুরি করতে চাও, তাহলে এই নাও সুযোগ।" এককথায় শরনাগত না হলে জীবের বাসনা অনুযায়ী ভগবান তাকে পরিচালনা করেন। এই জন্য ভগবানের শরনাগত না হওয়ায় অসৎ কর্মে লিপ্ত হওয়ায় চুরি করা পাপ কাজ অবশ্যই হবে।

প্রশ্ন : ৪২০ ॥ ভগবান কলিযুগের শেষে কল্কিরূপে আসবেন বলা হয়েছে। সেই সময় তিনি কি করবেন?

উত্তর : কলিযুগের সময়সীমা হল ৪,৩২,০০০ বছর। কলিযুগ শেষ হওয়ার ৫ হাজার বছর আগেই ভগবান কল্কিদেব বিষ্ণুযশা নামক এক ব্রাহ্মনের পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন।

কলিযুগের শেষ দিকে মানুষ এতটাই অধঃপতিত হবে যে তারা ভগবানের কোন নির্দেশ বা উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হবে না। ভগবান কৃষ্ণ গীতায় যে ধরনের উপদেশ-নির্দেশ দিয়েছেন ঐ ধরনের কোন কাজ কল্কীদেব করবেন না। অধঃপতিত মানুষদের মুক্তির জন্য তাই তিনি তাদেরকে হত্যা করবেন। ভগবানের দ্বারা কেউ নিহত হলে তার মুক্তি হয়। এটি ভগবানের একটি কৃপালু গুণ। তিনি রক্ষা করুন কিংবা বধ করুন ফলাফল একই। এইভাবে কলিযুগের শেষ দিকে আবির্ভূত হয়ে কল্কিদেব সবকিছু ধ্বংস করবেন এবং তারপর আবার সত্যযুগ পুনরায় শুরু হবে।

প্রশ্ন : ৪২১ ॥ ভক্তের জন্য দুর্দিন বা দুঃসময় কোনটি?

উত্তর : ভক্ত কীর্তনীয় সদা হরি—এই নীতিতে বিশ্বাসী হন। তিনি সবসময় হরিনাম করেন। **শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র** গ্রন্থে শ্রী মহাদেব নারদ মুনিকে বলেছিলেন মেঘাচ্ছন্ন দিনকে আমি দুর্দিন বলে মনে করি না। যেদিন কৃষ্ণকথা হয় না, আমি সেই দিনকেই দুর্দিন বলে মনে করি। যেই মুহূর্তটি কৃষ্ণ নাম বা কৃষ্ণ কথা ছাড়া অতিবাহিত হয়, সেই মুহূর্তটি বৃথা গেল বলে মনে করি।" মহাদেব বা শিব হলেন শ্রী কৃষ্ণের পরম ভক্ত। তাঁর উপরোক্ত কথা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় হরিকীর্তন ছাড়া যে মুহূর্ত বা দিন যায় তাই হল ভক্তদের জন্য দুর্দিন।

প্রশ্ন : ৪২২ ॥ ভগবানের কি কোন সুনির্দিষ্ট নাম আছে যাতে কেবলমাত্র সেই নামেই তাঁকে ডাকা যায়?

উত্তর : প্রকৃত পক্ষে ভগবানের কোন সুনির্দিষ্ট নাম নেই। কারণ তাঁর নাম অসংখ্য। তাঁর নামের কোন অন্ত নেই। এজন্য তাঁকে কোন সুনির্দিষ্ট নামের মধ্যে আবদ্ধ বা সীমিত রাখা যায় না। তবে কৃষ্ণ নামটিই তার সমস্ত নামের মধ্যে মুখ্য নাম। তিনি সবাইকে আকর্ষণ করেন। তাই আমরা তাঁকে কৃষ্ণ বলি যার অর্থ হলো সর্বাকর্ষক। তাই ভগবানকে কোন বিশেষ নামে যদি ডাকতে হয় তবে কৃষ্ণ হল সেই নাম।

প্রশ্ন : ৪২৩ ॥ ভেট দ্বারকা কি?

উত্তর : ভেট একটি গুজরাটি শব্দ যার অর্থ হল দ্বীপ। এই দ্বীপটিতে একটি প্রাচীন দ্বারকাধীশ মন্দির রয়েছে। এই দ্বীপের মানুষেরা দাবী করেন যে এই ভেট দ্বারকাই আসল দ্বারকা। এই ভেট দ্বারকা দ্বীপটি বর্তমানের দ্বারকা নগরী থেকে ৩০ মাইলের কিছুটা বেশি দূরে অবস্থিত।

প্রশ্ন : ৪২৪ ॥ ভগবৎ প্রাপ্তি যদি জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয় তবে সংসারে থাকিয়া সাধনা করলে হবে না কেন, তার জন্য সংসার ত্যাগ করার কি প্রয়োজন?

উত্তর : সনাতন ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রে গার্হস্থ্য ধর্মের বা আশ্রমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। মনু গার্হস্থ্যকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলেছেন।

কারণ গৃহস্থই অন্যান্য আশ্রমী—ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসীকে পোষণ করেন। (মনু সংহিতা ৬/৮৯-৯০)। মহাভারতেও (শান্তি পর্ব ১৯১/১০) একই কথা বলা হয়েছে। প্রচলিত শাস্ত্র গ্রন্থানুযায়ী এই আশ্রমে থাকলে মোক্ষ প্রাপ্তি হবে না। সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করতেই হবে। ভক্তিবাদী শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যারা প্রকৃত ভগবৎ ভক্ত তারা যে কোন আশ্রমে থাকলেও ভগবানের কৃপা লাভ তথা সত্যিকারের মুক্তি লাভ অর্জনে সক্ষম হবেন। তাই সংসার আশ্রমে থেকেও ভগবৎ সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করতে পারলে অবশ্যই ভগবৎ কৃপা লাভ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন : ৪২৫ ॥ ভক্তিমার্গের সারতত্ত্ব জানতে চাই। সেগুলো কি কি?

উত্তর : ভক্তিমার্গের বিভিন্ন বিষয় শ্রীমদ্ ভগবদ্‌গীতা, নারদীয় ভক্তিসূত্র, শ্রীমদ্ ভাগবতম, মহাভারত ইত্যাদি শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে।

ভক্তির অর্থ হল ভগবৎপ্রেম বা ভগবানকে ভালবাসা। এই ভালবাসা বা প্রেম নিম্নোক্ত ধরনের হতে পারে—

১. **অনন্যা বা ঐকান্তিকী**। দেহ এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সব বিষয়ে নিস্পৃহ হতে হবে। একেই গীতায় অব্যভিচারিনী ভক্তি (গীতা ১৩/১০) বলা হয়েছে।

২. **আত্মনিবেদিতা** বা **সর্বসমর্পিতা** (আত্মনিবেদন)। ভক্ত সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করবেন। তাঁর নিজের বলতে কিছুই থাকবে না।

৩. **ব্যাকুলতা**। যিনি প্রেমাস্পকে (ভগবানকে) ঐকান্তিক ভালবেসে নিজেকে সমর্পণ করেন তিনি ক্ষণমাত্র তাঁর (ভগবানের) বিস্মৃতি কিরূপে সহ্য করবেন? এই পরম ব্যাকুলতাই ভক্তির প্রকৃষ্ট লক্ষণ (নারদীয় ভক্তিসূত্র ৩/১৯)।

৪. **অহৈতুকী**। ভক্ত স্বর্গ এবং এমনকি নিজের মুক্তি পর্যন্ত কামনা করেন না। ভগবানকে ভালবাসাই তাঁর উদ্দেশ্য, অন্য কিছু নয়। কারণ পরমেশ্বর ভগবানইতো সমস্ত রস, সকল

আনন্দের আধার এবং উৎস। সেই নিরন্তর রস আস্বাদন করা মুক্তি অপেক্ষাও শ্রেয়। এই হল নিষ্কাম ভক্তি। এই জন্যই শ্রীমদ্ ভাগবতে (১২/২৩/২২) ভক্ত বলছেন : হে বাসুদেব, জন্মে জন্মে আপনার পদযুগলে আমার ভক্তিজন্মে, আপনি এই বিধান করুন।

প্রশ্ন : ৪২৬ ॥ ভক্তেরা নিজের মুক্তি চান না বলেন। তাহলে কি তারা মুক্তি বা মোক্ষের বিরোধী?

উত্তর : ভক্তিমার্গী মুক্তিও চান না, শুধুমাত্র এই বললে ভাগবত এবং গীতার বিপরীত উক্তি করা হবে। শ্রীমদ্ ভাগবতে (১২/১৩/১৮-২২) দেখা যায় যে এই ভাগবত পুরাণ যাতে জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তি-নিষ্কাম ইত্যাদির নির্দেশ আছে তা ভক্তিসহকারে পাঠ বা শ্রবণ করলেও কেউ বিমুক্ত হতে পারেন। এই জন্যই মুক্তিকামী পরীক্ষিৎ মহারাজ ভাগবত শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন।

গীতার ১৮তম অধ্যায়কে **মোক্ষযোগ** নামে অভিহিত করা হয়েছে এই কথা ভুললে চলবে না। এখানেও বলা হয়েছে—তুমি সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে মদ্‌গত চিত্তে এবং মদ্‌ভক্ত হয়ে আমাতে শরনাগত হও। আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে (অর্থাৎ কর্মফলরূপ সংসার বন্ধন) মুক্ত করবো (গীতা ১৮/৬৫-৬৬)। তাই ভক্তিমত যে মোক্ষবিরোধী তা ঠিক নয়। একই ধরনের কথা শ্রীমদ্ ভাগবতে (ভাগবত ৩/২৫/৩৩-৩৪, ৩/২৫/৩৬. ৩/২৫/৪০) আছে।

সুতরাং বলা যায় মোক্ষ চাওয়া এবং পাওয়া এক কথা নয়। ভক্তরা মুক্তি বা মোক্ষ চান না। তবে ভগবৎ কৃপায় পেয়ে থাকেন। কারণ যিনি ভক্তির বলে ভগবানের শ্রীচরণাশ্রিতা হতে পারলেন তার আর পুনঃজন্ম কোথায়। তাই মোক্ষ-ভক্তিযোগে নেই একথা বললে গীতা এবং ভাগবত বিরোধী হবে।

প্রশ্ন : ৪২৭ ॥ ভগবান ভক্তের কামনা সবসময়ই পুরণ করেন—এ ব্যাপারে দুই-একটি উদাহরণ দিন।

উত্তর : ভক্তের মহিমা অথবা গৌরব উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য ভগবান অনেক সময় ভক্তের অধীন হয়ে যান। অর্থাৎ ভক্ত যাই প্রতিজ্ঞা

করেন ভগবান তাই পুরণ করেন। মহাভারতে দেখা যায় ভগবান শ্রী কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন না। আর ভক্ত ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি কৃষ্ণকে অস্ত্র ধারণ করাবেন। ভক্তের এই বাসনা পুরনের জন্য ভগবান কৃষ্ণ নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলেন। আবার জয়দ্রথকে বধের জন্য তিনি তার সখা অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। এভাবে শত শত উদাহরণ দেয়া যাবে।

প্রশ্ন : ৪২৮ ॥ ভীষ্ম কত দিন শরশয্যায় অবস্থান করে দেহ ত্যাগ করেন? মৃত্যুকালে তিনি কি বলেছিলেন?

উত্তর : দীর্ঘ ৫৮ দিন শর শয্যায় থেকে মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সূর্যের উত্তরায়নকালে মহাজ্ঞানী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ভীষ্ম যোগযুক্ত হয়ে দেহ ত্যাগ করেন। একে ভীষ্মাষ্টমীও বলে। অন্তিমকালে তিনি বলেন—

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ (অনুশাসন পর্ব ১৬৭/৫১)

অর্থাৎ ধর্ম যেখানে জয় সেইখানে। তিনি আরোও বলেন—

সত্যেষু যতিতবং বঃ সত্যং হি পরমং বলম্।

(অনুশাসন পর্ব ১৬৭/৪৯)

অর্থাৎ তোমরা সত্য পালনে যত্ন করিবে। সত্যই পরম বল।

প্রশ্ন : ৪২৯ ॥ ভীষ্মতর্পণ কি যা পঞ্জিকায় দেখতে পাওয়া যায়?

উত্তর : পুষ্প-পত্রাদি দ্বারা পিতৃপুরুষকে জল দান বা তর্পনের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। এতে পিতৃ পুরুষেরা পরিতৃপ্ত হন। মহাবীর ভীষ্ম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী এবং পরম সত্যবাদী ছিলেন। তাঁর কোন পুত্র-পৌত্রাদি থাকার তাই প্রশ্নই উঠে না। তাই তার মতো সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় পুরুষের জন্য হিন্দুর নিত্যতর্পনে তাকে জল দান দ্বারা পরিতৃপ্ত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই তর্পনের নামই ভীষ্মতর্পন। প্রত্যেক যথার্থ হিন্দু এই চিরকুমার যোগী পুরুষকে স্মরণ করে বলে থাকে—

ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্র পৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্ ॥

অর্থাৎ শান্তনু নন্দন সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় বীর ভীষ্ম এই জলের দ্বারা পুত্র পৌত্রোচিত ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হউন।

প্রশ্ন : ৪৩০ ॥ ভীমসেন কখন এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তার আর নাম কি ছিল?

উত্তর : ভীমসেন কুন্তীদেবীর গর্ভজাত। যুধিষ্ঠিরের জন্মের পর পাণ্ডু পুনরায় কুন্তীকে একটি বলবান পুত্র লাভের জন্য অনুরোধ করলে কুন্তী বায়ুদেবকে আহ্বান করলে তাঁরই ঔরসে এই পুত্র লাভ করেন। চৈত্রমাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে দিনের বেলায় ষোড়শ দণ্ড সময়ে (১ দণ্ড = ২৪ মিনিট) শতশৃঙ্গ পর্বতে ভীমের জন্ম হয়। এই শিশু মহাবলশালী হওয়ায় তার নাম ভীমসেন রাখা হয়।

ভীমের উদরে বৃক নামে বহ্নভ অগ্নি বিরাজ করতেন। এইজন্য তার এক নাম বৃকোদর (বৃক + উদর = বৃকোদর) হয়।

প্রশ্ন : ৪৩১ ॥ ভীমের শারীরিক বল কিরূপ ছিল? কৌরবরা তাকে কেন উপহাস করে মাকুন্দ বলে অভিহিত করতেন?

উত্তর : কুরুপাণ্ডবদের মধ্যে দৈহিক শক্তিতে ভীমসেনই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি দশ হাজার হাতির সমান বল ধারণ করতেন।

তিনি তূবরক—অর্থাৎ তার মুখে দাড়ি এবং গোফ ছিল না। এজন্য কৌরবরা ঠাট্টা করে মাকুন্দ বলে অভিহিত করতেন।

প্রশ্ন : ৪৩২ ॥ ভীমের কতজন স্ত্রী ছিলেন? তার পুত্রের সংখ্যাই বা কত ছিল?

উত্তর : ভীমের চারজন স্ত্রী ছিল। তারা হলেন রাক্ষসী হিড়িম্বা, দ্রৌপদী, কাশীরাজের কন্যা বলন্ধরা এবং শল্যরাজের ভগিনী কালী। দ্রৌপদীর গর্ভে ভীমের একটি পুত্র জন্মে। তার নাম সুতসোম। অবশ্য শ্রীমদ্ ভাগবতে দেখা যায় তার নাম ছিল—শ্রুতসেন। বলন্ধরার গর্ভে তিনি সুর্বগ নামে এক পুত্র লাভ করেন। আর কালীর গর্ভজাত পুত্রের নাম ছিল সর্বগত। হিড়িম্বার গর্ভে জাত পুত্রের নাম ছিল ঘটোৎকচ। শেষোক্ত পুত্র কর্ণের হাতে এবং অন্যরা অশ্বত্থামার হাতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত হয়।

প্রশ্ন : ৪৩৩ ॥ ভীম দুঃশাসনের রক্তপান এবং দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ করেছিলেন কেন? এতে কি তার কোন পাপ হয় নাই?

উত্তর : যুধিষ্ঠির শকুনির সাথে পাশা খেলায় দ্রৌপদীকে পণ রেখে হেরে যান। তখন দুর্যোধন ও কর্ণের আদেশে দুঃশাসন দ্রৌপদিকে কুরুসভায় জোর করে এনে বিবস্ত্রা করার চেষ্টা করেন। এই দেখে ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে তার রক্ত পান করবেন। আবার দুর্যোধন দ্রৌপদিকে তার বাম উরু প্রদর্শন করায় ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে গদাযুদ্ধে তিনি দুর্যোধনের ঐ উরু ভঙ্গ করবেন।

ক্ষত্রিয়গণ যে কোন প্রতিজ্ঞা করতে পারতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজও করতে পারেন। এই হল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং প্রতিজ্ঞা করে তা পালন না করলে কোন লোক ক্ষাত্র ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে মনে করা হতো। এরপর দ্রৌপদী ছিলেন নিষ্পাপ। তাকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা করায় এমনিতেও দুঃশাসন ও দুর্যোধন মহাপাপ করেছিল। তাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় ভীমসেনের উপরোক্ত কাজ পাপ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

প্রশ্ন : ৪৩৪ ॥ পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথে ভীমসেনের পতন হয় কেন?

উত্তর : কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরোহন করেন। পয়ত্রিশ বছর রাজত্বের পর নানা রকমের দৈবদুর্ঘটনা দেখে তিনি মহাপ্রস্থানের জন্য তৈরি হলেন। দ্রৌপদীসহ অন্যান্য ভাইরা তার সঙ্গী হন। সমগ্র ভারতবর্ষ প্রদক্ষিণ করে তারা হিমালয় অতিক্রম করে মেরুপর্বতের নিকটবর্তী হলে একে একে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল এবং অর্জুন ভূমিতে লুটিয়ে পড়েন। এরপর ভীমসেনের পতন হয়। তিনি যুধিষ্ঠিরকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন—"তুমি বহুভুক ছিলে এবং নিজের শক্তির অহংকারে কাউকেই গণ্য করতে না। এই দোষেই তোমার পতন হয়েছে।" এই পতনই ভীমসেনের মহাপ্রস্থান।

প্রশ্ন : ৪৩৫ ॥ ভরত রামের পাদুকা গ্রহণ করে কোথা থেকে রাজত্ব চালাতেন?

উত্তর : ভরত রামের পাদুকা অযোধ্যার সিংহাসনে রেখে এই নগরীর বাইরে নন্দীগ্রামে অবস্থান করে রামের অবর্তমানে রাজত্ব চালিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ৪৩৬ ॥ ভগবদ্ ভক্তির মুখ্যরস কতটি এবং কি কি?

উত্তর : ভগবদ্ভক্তির মুখ্য বা প্রধান রস হল পাঁচটি। এগুলো হল : শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রস। পরমতত্ত্বরূপে ভগবানের প্রতি আসক্তি হলে তাকে শান্তরস বলা হয়। পরম প্রভুরূপে আসক্ত হলে তাকে দাস্যরস, সখা রূপে আসক্ত হলে সখ্যরস, তাঁকে সন্তানরূপে মনে করলে বাৎসল্য রস এবং প্রেমিকরূপে তাঁর প্রতি আসক্ত হলে সেটিকে মধুর বা মাধুর্য্য রস বলা হয়।

প্রশ্ন : ৪৩৭ ॥ ভাগবতের নবমস্কন্দে বলদেবকে বসুদেব পত্নী রোহিনীর সন্তান বলে বর্ণণা করা হয়েছে। আবার বলদেবকে দেবকীর পুত্রও বলা হয়। তাহলে কি করে তিনি দেবকী এবং রোহিনীর সন্তান হলেন?

উত্তর : দেবকী যখন সপ্তম গর্ভ ধারণ করেন তখন অনন্ত নামক শ্রী কৃষ্ণের অংশ প্রকাশ তাঁর গর্ভে আবির্ভূত হন। ঐ সময় ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াকে বললেন, "দেবকী ও বসুদেব কংসের কারাগারে অবরুদ্ধ হয়ে আছেন। আর আমার অংশ অনন্তদেব দেবকীর গর্ভে অবস্থান করছেন। তুমি গিয়ে দেবকীর গর্ভ থেকে তাঁকে রোহিনীর গর্ভে স্থানান্তর কর।" যোগমায়া তাই করলেন। এইজন্য অনন্তদেব তথা বলরাম বা বলদেবকে রোহিনী এবং দেবকী উভয়ের সন্তানরূপে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন : ৪৩৮ ॥ ভাগবতের বর্ণনা অনুযায়ী যোগমায়াই শ্রী কৃষ্ণের ভগিনীরূপে আবির্ভূতা হন যিনি দুর্গা, কালী ইত্যাদিরূপেও অভিহিতা। তাহলে বৈষ্ণবরা দুর্গাপুজা করলে দোষ কি?

উত্তর : কোন এক বিশেষ অবস্থায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াকে বৃন্দাবনে নন্দ ও যশোদার কন্যারূপে

আবির্ভূত হওয়ার নির্দেশ দেন। আর ভগবান নিজে দেবকী ও বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন এবং পরে নন্দালয়ে স্থানান্তর হন। ভগবান তখন যোগমায়াকে বলেছিলেন : "যেহেতু তুমি আমার ভগিনীরূপে আবির্ভূত হবে তাই পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ নানা ধরনের মূল্যবান সামগ্রি দ্বারা তোমার পুজা করবে। তুমিও তাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা চরিতার্থ করবে। যে সব মানুষ জড় সুখভোগের জন্য আসক্ত, তারা তোমাকে দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চন্দ্রিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়নী, ঈশানী, সারদা এবং অম্বিকারূপে পুজা করবে।"

তাই যোগমায়ার বিশেষরূপ হলেন দুর্গা, কালী ইত্যাদি যাদেরকে শ্রী কৃষ্ণের মায়াশক্তি বলা হয়। আর ভগবান হলেন শক্তিমান। শক্তি সবসময়ই শক্তিমানের অধীন তত্ত্ব। যারা জড়বাদী তারা শক্তির পুজা করে। কিন্তু যারা পরমার্থবাদী (বৈষ্ণবগণ) তারা শক্তিমানের পুজা করেন। শ্রী কৃষ্ণ হলেন পরম শক্তিমান। দুর্গা হলেন তাঁর পরাশক্তি। তাই বৈষ্ণবরা দুর্গা পুজার পরিবর্তে শ্রী কৃষ্ণের পুজাকেই অধিক শ্রেয় মনে করেন।

প্রশ্ন : ৪৩৯ ॥ ভগবান কৃষ্ণ কি দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসজাত পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : ভগবান কোন অতি উচ্চ স্তরের ভক্তকে কখনো কখনো কৃপা করার জন্য তাদের গৃহে আবির্ভূত হন। তিনি কখনোই কারো ঔরসজাত পুত্র হন না। ভগবান প্রথমে বসুদেবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। তারপর সেখান থেকে দেবকীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়ে শেষে তার গর্ভাশয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারপর তিনি সাধারণ শিশুদের মতই জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন : ৪৪০ ॥ ভাগবত অনুযায়ী দেবকীর গর্ভে ভগবান বিষ্ণু বা কৃষ্ণ আশ্রয় নিয়েছেন বুঝতে পেরেছিলেন কংস। তা সত্ত্বেও কেন কংস ঐ অবস্থায় দেবকীকে হত্যা করে নি?

উত্তর : কংস অসুর হলেও কিছু কিছু সামাজিক নিয়ম মেনে চলতো। দেবকীকে সরাসরি হত্যা না করার পেছনে কংসের মধ্যে নিম্নোক্ত চিন্তা ধারা কাজ করেছিল।

১. **প্রথমতঃ** দেবকীকে হত্যা করা জঘন্য কাজ হবে।
২. **দ্বিতীয়তঃ** দেবকীকে হত্যা করলে তার যশ এবং সুনাম সর্বতোভাবে বিনষ্ট হবে।
৩. **তৃতীয়তঃ** পুণ্য এবং আয়ু নষ্ট হবে।
৪. **চতুর্থতঃ** গর্ভবতী কোন নারীকে হত্যা করলে নরকের গভীরতম জায়গায় তার অধঃপতন হবে।

প্রশ্ন : ৪৪১ ॥ ভগবানের চিন্তায় সর্বক্ষণ মগ্ন থেকেও কংস কেন ভগবদ্ ভক্ত হতে পারে নাই?

উত্তর : কংস বৈরী বা শত্রুভাবে সবসময় কৃষ্ণের চিন্তা করতেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের মনও সব সময় ভগবানের চিন্তাতেই মগ্ন থাকে। কিন্তু ভক্ত অনুকূলভাবে ভগবানের চিন্তা করেন, প্রতিকূল বা বৈরীভাবে নয়। প্রতিকূলভাবে ভগবানের চিন্তা করায় কংস তাই ভগবৎ ভক্ত হতে পারেনি।

প্রশ্ন : ৪৪২ ॥ ভগবান কৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে থাকার সময় দেবতারা কি বলে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এবং কেন?

উত্তর : ভগবান হলেন পরম সত্য। সর্ব অবস্থায়ই তিনি পরম সত্য। তাই দেবতারা তাঁকে সত্যব্রত বলে অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন।

প্রশ্ন : ৪৪৩ ॥ ভগবানের নাম শ্যামসুন্দর কেন?

উত্তর : ভগবানের দিব্য রূপের জন্যই তাঁর নাম শ্যামসুন্দর। শ্যাম শব্দের অর্থ কালো। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরমেশ্বর ভগবানের রূপ কোটি কোটি কন্দর্পের চেয়েও সুন্দর—**কন্দর্প কোটি কমনীয়**। তাঁর অঙ্গকান্তি বর্ষার জলভরা মেঘের ন্যায় ঘনশ্যাম হলেও অপ্রাকৃত পরতত্ত্ব হওয়ায় তাঁর রূপ কন্দর্পের কমনীয় রূপের চেয়েও অনেক অনেক সুন্দর। এজন্যই তাঁকে শ্যাম সুন্দর নামে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন : ৪৪৪ ॥ ভগবানের আর্বিভাব কোন্ তিথি এবং নক্ষত্রে হয়েছিল?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে রোহিনী নক্ষত্রে এই জড়জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। **খ-মানিক্য** নামক জ্যোতিষ শাস্ত্রগ্রন্থে ভগবানের আবির্ভাবকালীন গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে।

প্রশ্ন : ৪৪৫ ॥ ভগবান বসুদেবের সামনে প্রথমে কিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ দেবকী ও বসুদেবের সামনে প্রথমে চতুর্ভূজ রূপে আবির্ভূত হন। চার হাতে তিনি শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা ধারণ করে আছেন। বক্ষে তাঁর শ্রীবৎস চিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তভ শোভিত কণ্ঠহার, পরনে পীতবসন, উজ্জ্বল মেঘের মত তাঁর গায়ের রং, বৈদুর্য মনিশোভিত কিরীট তাঁর মাথায় শোভা পাচ্ছে, নানা ধরনের মহামূল্য মনিরত্ন শোভিত সমস্ত অলঙ্কার তাঁর দিব্যদেহে শোভা পাচ্ছে, তাঁর মাথাভর্তি কুঞ্চিত কালো কেশ রাজি।

প্রশ্ন : ৪৪৬ ॥ ভগবান শ্রী কৃষ্ণ কেন বসুদেব এবং দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন?

উত্তর : স্বায়ম্ভুব মনুর সময় বসুদেব সুতপা নামে একজন প্রজাপতি ছিলেন। আর দেবকী ছিলেন সুতপার পত্নী পৃশ্নি। সেই সময় তারা দেবতাদের গণনা অনুসারে ১২,০০০ বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেন। সেই সময় তাদের চিত্ত পুরাপুরি পরমেশ্বর ভগবানে নিবিষ্ট ছিল। তাদের তপে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান চতুর্ভূজরূপে আবির্ভূত হয়ে বর প্রার্থনা করতে বললে তারা ভগবানকে পুত্ররূপে কামনা করেন। ফলে প্রথমে ভগবান সুতপা ও পৃশ্নির পুত্র পৃশ্নিগর্ভরূপে আবির্ভূত হন। পরবর্তী যুগে সুতপা ও পৃশ্নি কশ্যপ ও অদিতিরূপে যখন জন্ম নেন তখন ভগবান উপেন্দ্র বা বামনদেব নামে তাঁদের সন্তানরূপে আবির্ভূত হন। তৃতীয়বার সুতপা ও পৃশ্নি বসুদেব ও দেবকী হয়ে জন্ম নেওয়ায় ভগবান কৃষ্ণ নামে তাদের সন্তানরূপে আবির্ভূত হন।

প্রশ্ন : ৪৪৭ ॥ ভগবান শ্রী কৃষ্ণ কতদিন গোবৎস এবং গোপ শিশুরূপে লীলা বিলাস করেছিলেন?

উত্তর : ব্রহ্মা গোপসখা এবং গো-বৎসদেরকে একসময় হরণ করেছিলেন। তাই সখাদের মায়েদের পুত্র বিচ্ছেদের দুঃখ মোচনের

জন্য এবং ব্রহ্মার কাছে নিজের পরমেশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নিজেকে গোপশিশু এবং গো-বৎসরূপে প্রকাশিত করেছিলেন। একবছর ধরে কৃষ্ণ নিজেকে গোপশিশু এবং গোবৎসরূপে প্রকাশ করে বনে এবং ব্রজে ক্রীড়া করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৪৪৮ ॥ ভগবানের যোগমায়া এবং মহামায়া শক্তির মধ্যে মূল পার্থক্য কি?

উত্তর : মহামায়া হলেন ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি। আর যোগমায়া হলেন অন্তরঙ্গা শক্তি। সত্যকে যা আচ্ছাদিত করে তা হলেন মহামায়া যা বদ্ধজীবকে জড়ইন্দ্রিয়ের অতীত ভগবানকে বুঝতে দেয় না। কিন্তু যে শক্তি আংশিকভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে প্রকাশ করেন এবং আংশিকভাবে তাঁকে আচ্ছাদিত করে রাখেন তাকে বলা হয় যোগমায়া। যোগমায়াকে আশ্রয় করেই ভগবান এই জড়জগতে আবির্ভূত হন।

প্রশ্ন : ৪৪৯ ॥ ভগবানের এক নাম মুকুন্দ কেন?

উত্তর : মুকুন্দ শব্দের দুইটি অর্থ আছে। মুক শব্দের অর্থ হল মুক্তি। শ্রী কৃষ্ণ জীবকে মুক্তিদান করে দিব্য আনন্দ দান করেন। তাই তাঁর নাম মুকুন্দ। এর আরেকটি অর্থ হল কুন্দ ফুলের মতো সুন্দর হাস্যোজ্জল মুখ থাকায় তাঁকে মুকুন্দ বলা হয়।

**প্রশ্ন : ৪৫০ ॥ ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পরোপকার—শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু একথা বলেছেন। কেন বলেছেন?**

উত্তর : ভারতভূমি হল ভগবৎ-চেতনার উৎস ভূমি। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যারা মনুষ্যদেহ লাভ করেছে তাদের মধ্যে ভগবৎ—চেতনার সংস্কৃতি সঞ্চারিত করাই হল পরোপকার। এই মানব দেহের অপরিসীম গুরুত্ব এবং একমাত্র এই মনুষ্য জীবনেই পারমার্থিক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে জড়জগতের দুঃখদুর্দশা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব—এই তত্ত্ব সকলকে জানানোই হল আসল পরোপকার। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই অর্থেই পরোপকার শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্ন : ৪৫১ ॥ ভগবান সবযুগেই আবির্ভূত হয়ে দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশ করেছেন। তাহলে কলিযুগে মহাপ্রভুরূপে তা করলেন না কেন?

উত্তর : শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রভুর অনুরোধে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কেন এই জড়গতে অবতরণ করেছিলেন সে কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত হয়েছে—

লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন।
কিমতে এসব লোকের হইবে তারণ ॥
কৃষ্ণ অবতরি করেন ভক্তির বিস্তার।
তবে ত' সকল লোকের হইবে নিস্তার ॥

এই লীলায় দুস্কৃতিকারীদের চেতনার পরিবর্তন করে ভগবান তাঁর অহৈতুকী করুনার প্রভাবে তাদের উদ্ধার করেন। এই জন্যই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে শ্রীল রূপ গোস্বামী **মহাবদান্য অবতার** বলেছেন।

প্রশ্ন : ৪৫২ ॥ ভক্তি জগতের মর্কটদের চিনবার উপায় কি?

উত্তর : অতিসংক্ষেপে বলা হচ্ছে যারা বিরক্ত বেষী, যোষিৎ সঙ্গী (অবৈধ স্ত্রী সঙ্গী) এবং কপটপরায়ন তারাই হল মর্কট বৈরাগী।

প্রশ্ন : ৪৫৩ ॥ ভগবানের পরা এবং অপরা প্রকৃতি কি?

উত্তর : বিষ্ণু পুরানে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পরা (উৎকৃষ্ট) এবং অপরা (নিকৃষ্ট) প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা আছে। যে জড়া শক্তিতে আমরা বর্তমানে জড়িত তাকে বলা হয় অবিদ্যা বা নিকৃষ্টা শক্তি। এই শক্তির দ্বারা জড়জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু উৎকৃষ্ট আর একটি শক্তিকে বলা হয় ভগবানের পরাশক্তি। এই পরাশক্তি নিকৃষ্ট জড় শক্তি থেকে ভিন্ন। সেই পরাশক্তি ভগবানের শ্বাশত বা মৃত্যুহীন সৃষ্টি গঠন করে (গীতা ৮/২০)। এক কথায় ব্রহ্মার কর্তৃত্বাধীন এই মহাজাগতিক প্রকাশ ভগবানের শক্তির চারভাগের একভাগ মাত্র। এই শক্তিকে অপরা প্রকৃতি বলে। ব্রহ্মার সৃষ্টির অতীত ভগবানের শক্তির চারভাগের তিনভাগ শক্তিকে ত্রিপাদ বিভূতি বলে। এটিই হল উৎকৃষ্ট শক্তি, অর্থাৎ পরা প্রকৃতি।

প্রশ্ন : ৪৫৪ ॥ ভগবানকে হৃষীকেশ এবং অধোক্ষজ বলা হয়। এদের অর্থ কি?

উত্তর : হৃষীকেশ হচ্ছেন পরমাত্মা এবং অধোক্ষজ হলেন পরমেশ্বর ভগবান।

প্রশ্ন : ৪৫৫ ॥ ভগবানের কাছে ভক্তের প্রার্থনা কিরূপ হওয়া উচিত?

উত্তর : শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের কাছে জড়জাগতিক বা পারমার্থিক কোন বরই কামনা করেন না। ভগবানের কাছে তার একমাত্র প্রার্থনা— জীবনের কোন অবস্থাতেই যেন তিনি ভগবানের চরণকমল বিস্মৃত না হন। স্বর্গ বা নরক যেখানেই অবস্থান করতে হোক না কেন শুদ্ধ ভক্তের তাতে কিছু যায় আসে না। প্রতি মুহূর্তে ভগবানের চরণারবিন্দ স্মরণ করতে পারলে তিনি যে কোন জায়গায় অবস্থান করেই সন্তুষ্ট। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুও এই রকম প্রার্থনাই তাঁর শিক্ষাষ্টকে উপদেশ দিয়েছেন। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে জন্ম জন্ম ধরে শুধু ভগবৎ সেবাই তিনি কামনা করেন।

প্রশ্ন : ৪৫৬ ॥ ভগবান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভক্তকে ঐশ্বর্য প্রদান করেন না কেন?

উত্তর : অতিরিক্ত ঐশ্বর্যের প্রভাবে বহু-মহান ব্যক্তিত্বশালী তাদের সুউচ্চ পদ থেকে পতিত হয়। এই জন্য যখন কেউ ভগবানের কাছে ঐশ্বর্য কামনা করেন তখন ভগবান কখনো কখনো তা দান করেন না। এই ব্যাপারে তাঁর ভক্তের ক্ষেত্রে তিনি খুবই সতর্ক। জড়জগতে অবস্থান করায় পতনের সম্ভাবনা হেতু অপরিণত ভক্তকে ভগবান বিপুল ঐশ্বর্য প্রদান করেন না। কারণ ভক্তের যাতে পতন না হয় সেদিকেই ভগবানের প্রথম লক্ষ্য। তিনি হচ্ছেন কল্যাণকামী পিতার মতো, যিনি অপরিণত বয়স্ক পুত্রকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দান করেন না। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে অর্থের সদ্ব্যবহার করতে শিখলে পিতা সমস্ত ধন-ভাণ্ডারই পুত্রকে দান করেন।

প্রশ্ন : ৪৫৭ ॥ ভগবান সম্পর্কে নির্ব্বিশেষ বা মায়াবাদীদের ধারণা কি?

উত্তর : নির্ব্বিশেষবাদীরা বেদবানী **সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম**—সব কিছুই ব্রহ্ম-এর উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ব্রহ্মেরও পরম কারণ থেকে যে বৈচিত্রময় প্রকাশসমূহ উদ্ভুত হয়েছে তা নির্ব্বিশেষবাদীরা বিবেচনা করে না। তারা বিবেচনা করে এই যে সব কিছুই ব্রহ্ম থেকে উদ্ভুত। ধ্বংসের পর সবকিছুই ব্রহ্মে লীন হয়ে যায় এবং প্রকাশের মধ্যবর্তী স্তরও ব্রহ্মই। যদিও মায়াবাদীরা বিশ্বাস করে যে প্রকাশের আগে বিশ্ব ব্রহ্মে ছিল, সৃষ্টির পর ব্রহ্মে অবস্থান করে এবং ধ্বংসের পর বিশ্ব ব্রহ্মেই বিলীন হয়, কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ তারা জানে না।

প্রশ্ন : ৪৫৮ ॥ কারা শ্রী কৃষ্ণকে জানতে পারে না বা পারবে না?

উত্তর : অভক্তেরা কখনও শ্রী কৃষ্ণকে জানতে পারবে না। কারণ ভগবান যোগমায়ার আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন। ভগবদ্ গীতাতেও বলা হয়েছে '**নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ**—অর্থাৎ ভগবান বলেছেন আমি সবার কাছে প্রকাশিত হই না। কেবলমাত্র শুদ্ধ ভক্তের কাছেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। এই কারণেই দেখা যায় ভগবান যখন নরদেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন ভক্তরা তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপেই দেখেছিলেন, অভক্তরা তাঁকে শুধুমাত্র একজন সাধারণ মানুষ মনে করেছিল।

প্রশ্ন : ৪৫৯ ॥ কেউ কি মহাভারত পাঠ করেই ভগবদ্ ভক্ত হতে পারবে?

উত্তর : স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য আদি যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন তাদের জন্য শ্রীল ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করে গেছেন। মহাভারতের অংশ শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা। মহাভারতে ভগবানের লীলাও অনেকটা বর্ণনা করা রয়েছে। মহাভারত হল মূলত ইতিহাস এবং তা পাঠ করে, শ্রবণ করে এবং ভগবানের দিব্যলীলা স্মরণ করে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তির পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন।

প্রশ্ন : ৪৬০ ॥ কংস একসময় অষ্টভুজ বিশিষ্টা দুর্গার কথায় ভীত হয়ে বোন দেবকী ও বসুদেবকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেহ এবং আত্মা সম্পর্কে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা বলে তাদের কাছে ক্ষমা চান। এরপরও কৃষ্ণ কেন কংসকে নিহত করেছিলেন?

উত্তর : অসুররাও অনেক সময় পরিস্থিতির চাপে জ্ঞানগর্ভ কথা বলে। যেমন হিরন্যাক্ষের মৃত্যুর পর হিরন্যকশিপুও তার পরিবারবর্গকে অনেক জ্ঞান গর্ভ কথা বলে সান্তনা দিয়েছিল। কিন্তু আসুরিক স্বভাবহেতু এরা একসময় অনুশোচনা করলেও আবার বিষ্ণু, বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী হয়ে পড়ে। কংসের বেলায়ও তাই ঘটেছিল। তাই ভগবান তাকে হত্যা করেছিলেন যাতে তাঁর ভক্তরা রক্ষা পায়।

প্রশ্ন : ৪৬১ ॥ কৃষ্ণ কোন্ অবস্থায় তাঁর মা যশোদাকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন এবং মা কি কি দেখেছিলেন? এই বিশ্বরূপ কি অর্জুনকে দেখানোর মতই বিশ্বরূপ ছিল?

উত্তর : একদিন মা যশোদা শ্রী কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে স্তন্য দুগ্ধ পান করাবার পর কৃষ্ণ মুখে হাই তোলেন। তখন যশোদা দেবী তাঁর মুখের মধ্যে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্য, জ্যোতিচক্র, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, পর্বত, নদী, বন এবং স্থাবর জঙ্গম সমস্ত কিছু দেখতে পান। এভাবে কৃষ্ণ তাঁর মাকে বিশ্বরূপ দর্শন করান।

আবার মাটি খাওয়ার অপবাদ থেকে বাচার জন্য মার আদেশে শ্রী কৃষ্ণ তাঁর মুখ হাঁ করলেও যশোদা তাঁর মুখের ভিতর সমস্ত সৃষ্টি দেখতে পেয়েছিলেন।

যশোদাকে দেখানো বিশ্বরূপ ছিল স্থিত (স্থিতি) পর্যায়ের। অর্জুনকে দেখানো বিশ্বরূপ ছিল পূর্ণাঙ্গ—অর্থাৎ অর্জুনকে তিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় রূপ দেখান।

প্রশ্ন : ৪৬২ ॥ কৃষ্ণের দাম বন্ধন লীলা কি? পরমেশ্বর ভগবান হওয়া সত্ত্বেও কেন শ্রী কৃষ্ণ যশোদার দড়িতে আবদ্ধ হয়েছিলেন?

উত্তর : কৃষ্ণের দুষ্টুমিতে একসময় তাঁকে শাস্তি দেয়ার জন্য মা যশোদা তাঁকে সাধারণ বালকের ন্যায় দড়ি (দাম) দ্বারা উদুখলে বেঁধে

রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন কৃষ্ণকে বাঁধতে গেলেন তখন দেখলেন যে দড়িটি দুই আঙ্গুল পরিমাণে ছোট। আরও দড়ি এনে সেগুলো জুড়ে বাধবার চেষ্টা করলেন। প্রতিবারই লক্ষ্য করলেন দড়ি দুই আঙ্গুলই ছোট থেকে যাচ্ছে। গৃহের সমস্ত দড়ি এনেও মা যশোদা তাঁকে বাধতে না পেরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় ভগবান কৃপাপূর্বক বন্ধনগ্রস্ত হন। ভগবান তাঁর ভক্ত যশোদা মাকে আনন্দ দানের জন্যই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৪৬৩ ॥ কৃষ্ণ অঘাসুরকে বধ করেন। এই অঘাসুর কে ছিল? সে কিভাবে অজগরের রূপ ধারণ করতে পেরেছিল?

উত্তর : অঘাসুর ছিল পুতনা রাক্ষসী এবং বকাসুরের ভাই। অঘাসুর যোগসিদ্ধিতে অভিজ্ঞ ছিল। অষ্টাঙ্গ যোগের মহিমা সিদ্ধি নামক এক যোগের সাহায্যে কোন যোগী নিজেকে তার ইচ্ছা অনুসারে যে কোন আকার ধারণ করতে পারে। অঘাসুর এই যোগসিদ্ধির সাহায্যে তাই এক যোজন রূপী (১ যোজন = ৮ মাইল) একটি বিশাল অজগরের রূপ ধারণ করেছিল।

প্রশ্ন : ৪৬৪ ॥ কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর এবং যুবক কোন্ কোন্ বয়সে মানুষ পৌছে?

উত্তর : পাঁচ বছরের কম বয়সের বালকদেরকে বলা হয় কুমার এবং সেই অবস্থাকে কৌমার বলা হয়। পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত বয়সকে বলা হয় পৌগণ্ড এবং দশ থেকে পনের বছর পর্যন্ত বয়সকে বলা হয় কৈশোর। পনের বছরের পর বালকদেরকে বলা হয় যুবক।

প্রশ্ন : ৪৬৫ ॥ অষ্টমী তিথিতে শ্রী কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল। এই সময়ে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছিল কি করে?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই চন্দ্র রাত্রে অপূর্ণ থাকলেও সেই বংশে ভগবানের আবির্ভাবের জন্য আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সেদিন পূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন।

প্রশ্ন : ৪৬৬ ॥ অঘাসুর যে কৃষ্ণকে মারতে এসেছিল সে এত পাপাত্মা হলেও কেন সাযুজ্য মুক্তি পেয়েছিল?

উত্তর : সাযুজ্য মুক্তির অর্থ হল পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। অঘাসুর ছিল পাপাত্মা। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ তার শরীরে প্রবেশ করায় সে তার সমস্ত পাপ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর এই বিশেষ অবস্থায় এই অসুরকে ভগবান তাঁর দেহে লীন হয়ে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করেন।

প্রশ্ন : ৪৬৭ ॥ অনেকে ভগবানের জন্য অর্থ ব্যয় করে আবার নিজের নামও প্রচার করেন। এটি কি ঠিক?

উত্তর : না। ভগবানের সেবা করে ঢাক-ঢোল বাজাতে নেই—অর্থাৎ প্রচার করতে নেই। বৈষ্ণব আচার্য শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর কথায় "সেবা করিয়াছি বলিয়া অন্তরেও ঢাক পিটাইবার যত্ন করিও না। তখন আর ইহাকে সেবা বলা যাইবে না।"

প্রশ্ন : ৪৬৮ ॥ অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব কি? সহজ করে বলবেন।

উত্তর : গুণগতভাবে ব্রহ্ম, জীব এবং প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য বা অভেদ রয়েছে। কিন্তু আয়তনগতভাবে ভেদ বা পার্থক্য রয়েছে। গুণগতভাবে জীবও ভগবানের মতই সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু আয়তনে জীব অতি ক্ষুদ্র চৈতন্য। ভগবান পূর্ণ বা বিভু চৈতন্য। যেমন সমুদ্রের এক বিন্দু জল এবং সমগ্র সমুদ্রের জল গুণগতভাবে একইরকম এবং একই গুণ সম্পন্ন। কিন্তু আয়তনগতভাবে এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সুতরাং অচিন্ত্য বস্তুর মধ্যে ভেদ এবং অভেদ—এই উভয়ই বর্তমাণ। একেই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব বলা হয় যা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রদান করেছেন।

প্রশ্ন : ৪৬৯ ॥ অনেকেই বলেন বৃক্ষের মধ্যে আত্মা আছে। তাহলে আমাদের মত বৃক্ষ কথা বলতে পারছে না কেন?

উত্তর : আত্মা চার ধরনের অবস্থায় থাকেন : আচ্ছাদিত, মুকুলিত, প্রস্ফুটিত এবং বিকশিত। বৃক্ষের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন তিনি পুরাপুরি আচ্ছাদিত অবস্থায় আছেন। তাই বৃক্ষ কথা বলতে পারে না আমাদের মত।

প্রশ্ন : ৪৭০ ॥ অর্জুনের রথকে কপিধ্বজ বলা হয় কেন?

উত্তর : কপি মানে হনুমান, ধ্বজ মানে পতাকা। অর্জুনের রথে হনুমানের প্রতিকৃতি সমন্বিত পতাকা ছিল। তাই এর নাম ছিল কপিধ্বজ।

প্রশ্ন : ৪৭১ ॥ অনন্ত বা শেষনাগ দেখতে কিরূপ?

উত্তর : অনন্তদেব হলেন সহস্র ফনাবিশিষ্ট সর্পরূপী। তাঁর ফনাগুলি বহুমূল্যবান জ্যোতির্ময় সুন্দর রত্ন দ্বারা বিভূষিত। দুই চোখ বিশিষ্ট প্রতিটি ফনা দেখতে ভয়ঙ্কর। তাঁর শরীর কৈলাস পর্বত-শৃঙ্গের মতোই তুষার শুভ্র। তাঁর জিহ্বা এবং কাঁধ নীলাভ।

প্রশ্ন : ৪৭২ ॥ নন্দ-যশোদার গৃহে যে কন্যা আবির্ভূত হন তিনি আসলে কে ছিলেন। তাঁর রূপ কি ধরনের ছিল?

উত্তর : তিনি ছিলেন প্রকৃত পক্ষে যোগমায়া। পরে বসুদেব তাঁকে যখন কংসের কারাগারে এনে দেবকীর কোলে স্থাপন করেন তখন তিনি দুর্গারূপ গ্রহণ করেন। কংস দেবকীর কোল থেকে এই দেবীকে ছিনিয়ে নিয়ে মেঝেতে আছাড় মারতে উদ্যত হলে তিনি কংসের হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে আকাশে উঠে অষ্টভূজ ধারণ করেন। তিনি অপূর্ব সুন্দর বস্ত্র, পুষ্পমাল্য এবং অলঙ্কারে ভূষিতা ছিলেন। তাঁর আটটি হাতে ধনুক, বাণ, বল্লম, ঘণ্টা, শঙ্খ, চক্র, গদা এবং ঢাল ছিল।

প্রশ্ন : ৪৭৩ ॥ নন্দ মহারাজ এবং যশোদা পূর্বজন্মে কে ছিলেন? তাঁরা শ্রী কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাওয়ার কারণ কি ছিল?

উত্তর : নন্দমহারাজ পূর্বজন্মে একজন বসু ছিলেন। তিনি বসুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেই সময় তাঁর নাম ছিল দ্রোণ। আর যশোদা ছিলেন দ্রোনের পত্নী ধরা।

দুইজনে ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে তাঁরা যেন পরমেশ্বর ভগবানের পরম মাধুর্যময় বাল্য লীলায় মগ্ন থাকতে পারেন। ব্রহ্মা তাদেরকে এরূপ বরদান করায় দ্রোন নন্দ মহারাজ রূপে বৃন্দাবনে এবং ধরা তার পত্নীরূপে আবির্ভূতা হন। এভাবে নন্দ মহারাজ এবং যশোদা কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পেয়ে তাঁর প্রতি অনন্য ভক্তি লাভ করেন।

প্রশ্ন : ৪৭৪ ॥ নারায়ন শব্দ দ্বারা কি বুঝানো হয়?

উত্তর : নার শব্দের অর্থ হল সমগ্রজীব নিচয় এবং অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুকে নারায়ন বলা হয়। কারণ তিনি গর্ভসমুদ্রের জলে শয়ন করে থাকেন এবং সেই সঙ্গে তিনি হলেন সমস্ত জীবের আশ্রয়। নারায়ন সকল জীবের হৃদয়েও বর্তমান থাকেন। কারণ অয়ন শব্দটির অন্য এক অর্থ হল সমস্ত জ্ঞানের উৎস। শ্রী কৃষ্ণই আদি নারায়ন যা ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মার মুখ থেকে প্রতিপন্ন হয়েছে।

প্রশ্ন : ৪৭৫ ॥ নারায়ন জ্বর এবং শিবজ্বর নামক নাকি অস্ত্র আছে? থাকলে এসব অস্ত্রের অধিকারী কে এবং এগুলোর কাজ কি?

উত্তর : দেবাদিদেব মহাদেবের বহু অস্ত্রের মধ্যে শিবজ্বর হল অন্যতম। এটি অসীম তাপ উৎপন্নকারী এক ধরনের বিধ্বংসী মারনাস্ত্র। শাস্ত্রীয়বচন অনুসারে সৃষ্টিনাশের সময় সূর্যের তাপ সাধারণ অবস্থার চেয়ে ১২ গুণ বেশি হয়। এই তাপ সম্পন্ন অস্ত্র হল শিবজ্বর যা ত্রিশির এবং ত্রিপদ বিশিষ্ট। বানাসুরের পক্ষে শ্রী কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় শিব এরূপ অস্ত্র শ্রী কৃষ্ণের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন।

নারায়নজ্বর হল ভগবান শ্রী কৃষ্ণের অন্যতম এক অস্ত্র। এই অস্ত্র অপরিমেয় শীত উৎপন্ন করে। শিবের নিক্ষেপ করা শিবজ্বর অস্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্য ভগবান শ্রী কৃষ্ণ এই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৪৭৬ ॥ নিরীশ্বরবাদী কপিলদেবের সাংখ্য দর্শন আসলে কি? এই মতবাদ কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

উত্তর : নিরীশ্বরবাদী কপিলদেবের সাংখ্য তত্ত্বের মূল কথা হল এই জড়জগতের পরিণাম অনিত্য বা অলীক হওয়ায়, কারণটিও অলীক। সাংখ্য তত্ত্ববাদীরা শূন্যবাদের সমর্থক। কিন্তু বস্তুত পরমেশ্বর ভগবানই হলেন আদি কারণ। এই দৃশ্যমান বিশ্ব হল ভগবানের অনিত্যজড় প্রকাশ। এই অনিত্য জড় প্রকাশের বিনাশ হলেও তার কারণ, নিত্য বিরাজমান চিন্ময় জগৎ যথাযথ বর্তমান থাকে। তাই চিন্ময় জগৎকে সনাতম ধাম বলা হয়। এই জন্য সাংখ্যতত্ত্ববিদদের যুক্তি অকাট্য নয়।

প্রশ্ন : ৪৭৭ ॥ পুতনা রাক্ষসীকে ভাগবতে খেচরী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই খেচরী বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : খেচর বলতে এমন প্রাণী বুঝায় যারা আকাশে উড়তে পারে। একধরনের পিশাচী আছে যাদেরকে খেচরী বলা হয়—অর্থাৎ তারা আকাশে উড়তে পারে। এই ধরনের পিশাচী-বিদ্যা ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কোন কোন গহীন জায়গায় আজও কিছু স্ত্রীলোক চর্চা করে থাকে। তারা উপরে ফেলা গাছের ডালে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। পুতনা এই বিদ্যা জানত। সেজন্য তাকে শ্রীমদ্ ভাগবতে খেচরী বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ৪৭৮ ॥ পুতনা তাঁকে হত্যা করতে আসলেও কৃষ্ণ তাকে কেন মাতৃরূপে গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী মাতা সাত ধরনের—গর্ভধারিনী মাতা, গুরুপত্নী, রানী, ব্রাহ্মণপত্নী, গাভী, ধরিত্রী এবং ধাত্রী। পুতনা শ্রী কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে তাঁকে তার বুকের দুধ পান করানোর জন্য স্তন্য দান করেছিল। তাই শ্রী কৃষ্ণ তাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৪৭৯ ॥ পুতনাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করেও কৃষ্ণ কেন তাকে সংহার করেছিলেন?

উত্তর : পুতনা রাক্ষসী যেহেতু তার বুকের দুধ দান করবার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল তাই তিনি তার মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন এবং তার সে কার্যকলাপ মাতৃবৎ বলে গ্রহণ করেছিলেন। আর রাক্ষসীর বীভৎস কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য তাকে তৎক্ষণাৎ সংহার করেছিলেন। কারণ সে কংসের চর হিসাবে বহু শিশুকে সংহার করেছিল।

প্রশ্ন : ৪৮০ ॥ পৃথিবীতে কত ধরনের জীব আছে এবং সেগুলো কি কি?

উত্তর : এই পৃথিবীতে চুরাশি (৮৪) লক্ষ ধরনের জীব আছে। এই সম্পর্কে বিষ্ণুপুরানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : জলজ জীব ৯ লক্ষ, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদির মতো স্থাবর জীব আছে ২০ লক্ষ, কৃমি, কীট, সরীসৃপ

রয়েছে ১১ লক্ষ এবং পক্ষী শ্রেণীর জীব আছে ১০ লক্ষ। পশু শ্রেণীর জীব আছে ৩০ লক্ষ এবং সবশেষে মানুষ রয়েছে ৪ লক্ষ প্রজাতির—সবমিলিয়ে ৮৪ লক্ষ।

প্রশ্ন : ৪৮১ ॥ পঞ্চতত্ত্বের পুজা কেন করা হয়?

উত্তর : শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে কলিযুগে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদগণসহ অবতীর্ণ হয়ে সকলকে **হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র** কীর্তন করাবেন—অর্থাৎ কলিযুগ থেকে উদ্ধারের জন্য জীবকে হরিনাম বিতরণ করবেন। এই জন্যই তাঁর পার্ষদগণসহ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে পঞ্চতত্ত্বরূপে পুজা করা হয়। অর্থাৎ শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত আচার্য প্রভু, গদাধর প্রভু এবং শ্রীবাস প্রভুসহ তিনি পুজিত হন।

প্রশ্ন : ৪৮২ ॥ পঞ্চশূনা যজ্ঞ কি?

উত্তর : গৃহস্থ ব্যক্তিরা জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাতসারে পাঁচ রকমের পাপকর্ম করে থাকে। যেমন অঙ্গন মার্জনের সময়, অগ্নিসংযোগে, খাদ্য গ্রহণের সময়, পথ চলার সময় আমরা বহু জীবকে হত্যা করি। জ্ঞাত সারেই হোক অথবা অজ্ঞাত সারেই হোক বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে আমরা জীব হত্যা করি। এই রকম পাপ-কর্মের ফল থেকে মুক্তির জন্য এক ধরনের যজ্ঞ করা হয়। তাকে পঞ্চশূনা যজ্ঞ বলা হয়।

প্রশ্ন : ৪৮৩ ॥ কৃষ্ণকে গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ বলা হয় কেন?

উত্তর : শ্রী কৃষ্ণ তাঁর গার্হস্থ্য লীলায় সর্বাগ্রে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের কল্যাণ সাধন করা কর্তব্য মনে করতেন। এজন্য তিনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণদের মধ্যে ১৩,০৮৪টি গাভী দান করতেন। সবৎসা, দুগ্ধবতী শান্ত এইসব গাভীদের দানের সময় তিনি ব্রাহ্মণদের রেশমের পোষাক, হরিণের চামড়া ও প্রচুর তিল শস্য দিতেন। এইসব কারণে তাকে গো এবং ব্রাহ্মণদের হিত কাজে রত ব্যক্তি বলে গণ্য করা হতো।

প্রশ্ন : ৪৮৪ ॥ পরমহংস কাদেরকে বলা হয়?

উত্তর : জলমিশ্রিত দুধ থেকে যেমন হংস জল পরিত্যাগ করে দুধ গ্রহণ করতে পারে, সেই রকম যিনি জড়জগতে অবস্থান করেও

ভগবানের চিন্ময় জগতে অংশ গ্রহণ করেন, যিনি জড়জগতের উপর নির্ভর না করে একমাত্র পরব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল এবং যিনি একাকী জীবনযাপন করেন তিনিই পরমহংস বলে পরিগণিত হন। পরমহংস স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি আর বৈদিক শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধি নিষেধ দ্বারা আবদ্ধ নন। পরমহংস একমাত্র শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ গ্রহণ করেন এবং যারা বিষয়াসক্ত তাদের সঙ্গ বর্জন করেন।

প্রশ্ন : ৪৮৫ ॥ প্রলয়ের পর কি হয়? আবার কিভাবে সৃষ্টি আরম্ভ হয়?

উত্তর : বিশ্ব প্রলয়ের পর সমস্ত শক্তিসহ নিখিল সৃষ্টি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করে। এই সময়ে সুদীর্ঘকাল ভগবান যোগনিদ্রায় শায়িত থাকেন। আবার সৃষ্টির প্রয়োজন হলে, শ্রুতিগণ ভগবানের চারদিকে সমবেত হয়ে তাঁর দিব্যলীলাসমূহের বর্ণনা করে তাঁর গুণকীর্তন করতে শুরু করেন। তা শুনে ভগবান যোগনিদ্রা থেকে ক্রমে ক্রমে জাগরিত হন এবং এরপর তার ইচ্ছায় আবার সৃষ্টিকার্য আরম্ভ হয়।

প্রশ্ন : ৪৮৬ ॥ পরমেশ্বর ভগবানের দেহ এবং আমাদের দেহের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : ব্রহ্মসংহিতায় পরমেশ্বর ভগবানের দেহকে সচ্চিদানন্দময় বলা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের দেহ অপ্রাকৃত, আমাদের মতো জড় নয়। তিনি সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ, তাঁর শরীর আনন্দ চিন্ময় রসে তৈরী। তাই তিনি যে কোন জিনিস উপভোগ করতে পারেন এবং তাঁর যে কোন অঙ্গ দ্বারা যে কোন কাজ করতে পারেন। কিন্তু আমরা আমাদের এক একটি অঙ্গ দ্বারা শুধুমাত্র এক একটি কাজ করতে পারি মাত্র। যেমন হাত কোন কিছু ধরতে পারে মাত্র, কিন্তু দেখতে বা শুনতে পায় না। সংসারে আবদ্ধ জীবাত্মার দেহ জড় এবং পাঁচটি ভৌত উপাদান মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি এবং আকাশ দ্বারা তৈরি। মৃত্যুর পর এইসব জড় পদার্থ ধ্বংস হয়ে যায়। ভগবানের দেহ নিত্য এবং শ্বাশত।

প্রশ্ন : ৪৮৭ ॥ ব্রহ্মা কৃষ্ণের সব সখা এবং গোবৎসদের হরণ করে তাদেরকে মায়া শয্যায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসে কি দেখেছিলেন?

উত্তর : ব্রহ্মা গোপশিশু এবং গোবৎসদের একটি পাহাড়ের গুহায় রেখে ফিরে এসে দেখলেন যে কৃষ্ণ আগের মতোই লীলা বিলাস করে চলেছেন। অর্থাৎ তিনি নিজেকেই বিস্তার করে গোবৎস এবং গোপবালকরূপে লীলা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকেরা যে আসল গোবৎস ও গোপপালক নয়, তা ব্রহ্মাকে বোঝাবার জন্য শ্রী কৃষ্ণ তাদেরকে বিষ্ণু মূর্ত্তিতে রূপান্তর করেন। প্রকৃত গোবৎস এবং গোপবালকদের বদলে ব্রহ্মা যাদেরকে দেখেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন শ্রী কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর প্রকাশ। বিষ্ণু হলেন শ্রী কৃষ্ণের প্রকাশ। তাই ব্রহ্মার সামনে সেই সব গোপ বালকেরা চতুর্ভূজ বিষ্ণু মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রশ্ন : ৪৮৮ ॥ বৈষ্ণব চরণে অপরাধ করলে কি গতি হয়? দুই একটি উদাহরণ দিন।

উত্তর : বৈষ্ণব চরণে অপরাধ করলে কোন লোকের জপ-তপসহ সব কিছুই নিষ্ফল হয়। সে ব্যক্তি মহাযোগি হলেও তার পতন হয়। যেমন দুর্বাসামুনি মহাভাগবত অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ করায় তাকে নানা দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আবার যমুনার জলে মাছ ধরার কারণে সৌভরী মুনি ভগবৎপার্ষদ গরুড়কে অভিশাপ দেওয়ায় তিনি তার তপস্যা থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন এবং এই জড়জগতে ইন্দ্রিয় পরায়ণ এক গৃহস্থে পরিণত হয়েছিলেন। সৌভরী মুনি, যিনি ধ্যানে ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন ছিলেন, তাঁর এই অধঃপতন বৈষ্ণব অপরাধের একটি ফল।

প্রশ্ন : ৪৮৯ ॥ বৃন্দাবনের গোপবালিকারা কেন এবং কিভাবে দুর্গা বা কাত্যায়নীর পুজা করতেন?

উত্তর : পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য বৃন্দাবনের গোপবালিকারা হেমন্তকালের প্রথম মাস অগ্রহায়ন মাসে

কাত্যায়নীর পুজা করেছিলেন। তাঁরা সকালবেলায় যমুনা নদীতে স্নান করে প্রতিদিন কাত্যায়নীর পুজা করতেন। তাঁরা যমুনার মাটির সঙ্গে বালি মিশিয়ে প্রতিমা তৈরি করে তাতে চন্দন লেপন ও মাল্য অর্পণ করে ধূপদীপ জ্বালিয়ে এবং সব ধরনের উপাচার সহকারে—ফল, ফুল, পল্লব ইত্যাদি দিয়ে কাত্যায়নীর পুজা করতেন।

প্রশ্ন : ৪৯০ ॥ ব্রজগোপীরা যাঁদের কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা হয় না, তাঁরাও দুর্গাদেবীর পুজা করেছিলেন। তাহলে বৈষ্ণবদের পুজা করতে আপত্তি কোথায়?

উত্তর : সাধারণ মানুষ দুর্গা পুজা করে জড়জাগতিক লাভের আশায়। গোপীরা এই উদ্দেশ্যে কাত্যায়নীর পুজা করেন নাই। তারা দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন শ্রী কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করতে পারেন। এই হল মাধুর্য প্রেম। তাৎপর্য হল শ্রী কৃষ্ণকে পাওয়াই যদি মূল এবং চরম উদ্দেশ্য হয় তাহলে ঐ উদ্দেশ্য সাধনে যে কোন পন্থা ভক্ত অবলম্বন করতে পারেন। কিন্তু এই রকম একনিষ্ঠভাবে কোন সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্গা পুজা করা সম্ভব নয়। তাদের দুর্গা পুজা শেষ পর্যন্ত জড়জাগতিক কামনা-বাসনা পুরনের উপায় হয়ে দাঁড়ায়। ভগবান কৃষ্ণের ভক্তকে কোন দেবদেবীর পুজা করতে হয় না।

প্রশ্ন : ৪৯১ ॥ বৃন্দাবনের গোপেরা ইন্দ্রযজ্ঞ করতেন। শ্রী কৃষ্ণ কেন সেই যজ্ঞ না করার জন্য তাদেরকে বলেছিলেন?

উত্তর : ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ না করার জন্য শ্রী কৃষ্ণ মূলত দুটি কারণ দেখিয়েছিলেন। প্রথমত: আর্থিক উন্নতির জন্য কোন দেবদেবীর পুজা করার প্রয়োজন নেই। দেবদেবীদের পুজা করে যে ফল লাভ হয় তা ক্ষণস্থায়ী এবং অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাই কেবল এই ধরনের ক্ষণস্থায়ী ফল লাভে উৎসাহী হয়। দ্বিতীয়ত যে সমস্ত অনিত্য ফল এই দেবদেবীদের পুজা করে লাভ হয় তা পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত দেবতারা দিতে পারেন না। তাছাড়া ইন্দ্র কিছুটা গর্বিত হয়ে পড়েছিলেন বলে শ্রী কৃষ্ণ তাকে একটু শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন করেছিলেন।

প্রশ্ন : ৪৯২ ॥ আমরা গাছের ফুল ও ফল শ্রী কৃষ্ণের পুজায় লাগাই। এতে গাছের কোন উপকার হয় কি?

উত্তর : যেসব গাছের ফুল এবং ফল দ্বারা শ্রী কৃষ্ণের পুজা করা হয় সেগুলোর প্রভূত কল্যাণ হয়। গাছ আমাদের মত সরাসরি ভগবানের সেবা-পুজা করতে পারে না। শ্রী কৃষ্ণের পুজায় যখন ফল-ফুল অর্পন করা হয় তখন যে সব গাছে এইসব ফল-ফুল ছিল সেগুলো তাদের অজ্ঞাতসারে সুকৃতি অর্জন করে এবং পরবর্তী জন্মে তার সুফল ভোগ করতে পারে।

প্রশ্ন : ৪৯৩ ॥ আজকাল দেখা যায় অনেকেই গৈরিকবসন পড়ে নিজেকে সন্ন্যাসী বলে পরিচয় দেয়। এরা কি আসলেই সন্ন্যাসী?

উত্তর : এককথায় আপনার প্রশ্নের উত্তর হল অন্তরে কৃষ্ণসেবার জন্য অনুরাগ না জন্মিলে বা না আসিলে কেবল বাইরে বেশ গ্রহণ করলেই তাকে সন্ন্যাসী বলা যায় না।

প্রশ্ন : ৪৯৪ ॥ আজকাল অনেকেই হরিসেবার কথা বলে জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নিজের ভোগের জন্য ব্যবহার করেন। এদের গতি কি হবে?

উত্তর : হরি সেবার অর্থ ভোগ করলে শাস্ত্রানুযায়ী সর্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড হতে হয়। সাধারণ চোরেরও কখনো কখনো মঙ্গল হয়। কিন্তু হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অর্থ ভোগকারীর কখনো মঙ্গল হয় না।

প্রশ্ন : ৪৯৫ ॥ আজকাল দেখা যাচ্ছে অনেক স্ত্রীই তার পতিকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে—অর্থাৎ ডাইভোর্স করছে। এটি কি সঠিক? এই বিষয়ে ভগবান কৃষ্ণের কি কোন উপদেশ শাস্ত্রে রয়েছে?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে দেখা যায় শ্রী কৃষ্ণ একজন স্ত্রীলোকের কর্তব্য সম্পর্কে গোপীদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কোন স্ত্রীলোক যদি পারমার্থিক উন্নতি করতে চায় তাহলে তাকে কখনই পতিকে ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত নয় বা তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া উচিত নয়। কোন বিবাহিত স্ত্রী লোকের পরপুরুষের সঙ্গ করা উচিত নয়; বৈদিক শাস্ত্রে তা নিষিদ্ধ। সরলচিত্তে পতি সেবা করাই হল সাধ্বী স্ত্রীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

প্রশ্ন : ৪৯৬ ॥ আজকাল দেখা যায় অনেক জায়গাই তারক ব্রহ্ম হরিনাম সংকীর্তনের শেষ দিনে কীর্তনীয়ারা কৃষ্ণের রাসলীলা পালা দেখান। শ্রোতাদের বেশিরভাগই ঐ রাসলীলা দেখেন। এটি কি সঠিক?

উত্তর : রাসলীলা অতি উচ্চ স্তরের বিষয়। কেবলমাত্র অতি শুদ্ধ ভক্তগণই এরূপ লীলা শ্রবণের অধিকারী, দেখার প্রশ্নই উঠে না। সংকীর্তনের সময় পাঁচ মিশেলী লোকের সমাবেশ হয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সাবধান করে দিয়েছেন যে বদ্ধজীব যেন কখনও ভগবানের অসাধারণ কার্যকলাপের অনুকরণ না করে। কেউ রাসলীলার অনুকরণ করতে পারে না। অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে যারা শ্রী কৃষ্ণের রাসলীলার অনুকরন করবার চেষ্টা করে তাদের সর্বনাশ হতে বাধ্য। এই জন্যই শাস্ত্রে সাধারণ মানুষদের কাছে রাসলীলা সম্পর্কে আলোচনা করতে পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে, অভিনয় করে দেখানোতো অতি দূরের কথা।

প্রশ্ন : ৪৯৭ ॥ আটজন পত্নী থাকা সত্ত্বেও শ্রী কৃষ্ণ আবার কেন ১৬,১০০ রমণীকে বিয়ে করেছিলেন?

উত্তর : ভৌমাসুর তথা নরকাসুর নামে এক অতিপাপিষ্ঠ অসুর বিভিন্ন রাজ্য থেকে বল প্রয়োগ করে ১৬,১০০ জন রাজকন্যাকে তার প্রাসাদে বন্দী করে রাখে। ভগবান শ্রী কৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করে এদেরকে উদ্ধার করেন। তাঁরা সর্বাকর্ষক ভগবানের রূপে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে তাকে পতিরূপে কামনা করেন এবং এজন্য বিধাতার কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন। সরল ও ঐকান্তিক রাজকন্যারা অনন্য ভক্তিসহকারে তাঁদের হৃদয় ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করেন। সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা ভগবান শ্রী কৃষ্ণ তাঁদের নির্মল ও শুদ্ধ আকাঙ্খা হৃদয়ঙ্গম করে তাদেরকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন। ভগবান শুদ্ধ ভক্তের বাসনা সবসময়ই পুরণ করেন—একথা বুঝতে হবে। শ্রী কৃষ্ণ ১৬,১০০ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে এক শুভলগ্নে যুগপৎ বিভিন্ন প্রাসাদে তাঁদের বিবাহ করেছিলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন শ্রীমতি লক্ষ্মীদেবীর অংশ প্রকাশ।

লেখক পরিচিতি

শ্রী মনোরঞ্জন দে মুন্সীগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত সিরাজদিখান উপজেলার রাজদিয়া গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু কায়স্থ পরিবারে ১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। মা-বাবা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বাড়ীতে শ্রী রাধাকৃষ্ণের মন্দির থাকায় ছোটবেলা থেকেই শ্রী বিগ্রহদ্বয়ের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। লেখাপড়া করেছেন নিজ গ্রামের রাজদিয়া অভয় উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমে কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরবর্তীতে অগ্রণী ব্যাংকে উচ্চ পদস্থ ব্যাংকার (সহকারী মহাব্যবস্থাপক) হিসেবে কাজ করেছেন। বি. এ (পাস), বি. এস. এস (সম্মান) এবং এম. এস. এস শ্রেণীতে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই লিখেছেন ২৫টি।

শ্রী মনোরঞ্জন দে বিভিন্ন সময়ে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক নিবন্ধ লিখেছেন এবং এখনও লিখেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির মাসিক পত্রিকা "সমাজ দর্পণ এবং ইস্‌কন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "হয়েকৃষ্ণ সমাচার" এবং ত্রৈমাসিক "অমৃতের সন্ধানে" পত্রিকায় এ পর্যন্ত তার লিখিত বহু ধর্মীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ।